সৎপ্রসঙ্গ

পূজা ও সমাজ, কবিতাকোরকম্, প্রবন্ধকলাপম্
প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত।

প্রকাশক
ম্যাকমিলান এণ্ড্ কোম্পানি লিমিটেড্
২৯৪ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

নিবেদন।

এই গ্রন্থ মৎপ্রণীত 'পূজা ও সমাজ' নামক গ্রন্থ হইতে সঙ্কলিত হইয়া প্রকাশিত হইল। হাই স্কুলের ৭ম ও ৮ম মানের পাঠোপযোগী করিবার অভিপ্রায়ে মূল গ্রন্থের কোন কোন অংশ পরিত্যক্ত এবং স্থলবিশেষে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। গ্রন্থ প্রকাশ করিতে হইলেই তাহার একটা কৈফিয়ত দেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। সুতরাং আমাদেরও একটা কৈফিয়ত দেওয়া আবশ্যক। 'পূজা ও সমাজ' গ্রন্থের সমালোচনাকালে অনেক সুবিজ্ঞ সাহিত্য-সেবী গ্রন্থখানি বিদ্যালয়ের পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত হইবার উপযোগী মনে করেন। কেহ কেহ ঐ পুস্তকের কোন কোন অংশ বর্জ্জন করিয়া একটী বিদ্যালয়-পাঠ্য সংস্করণ প্রস্তুত করিতে উপদেশ দেন। এই সকল অনুকূল মন্তব্য ও উপদেশই আমা-দিগকে এই পুস্তক প্রকাশে উৎসাহিত করিয়াছে। ইহা ছাত্রগণের কোন প্রকার উপকারে আসিলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

এই গ্রন্থ সঙ্কলন বিষয়ে অত্রত্য নর্ম্যাল স্কুলের অধ্যক্ষ আমার পরম সুহৃৎ শ্রীযুক্ত রায় সাহেব অঘোরনাথ অধিকারী মহাশয় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিলাম। ইতি—

শিলচর
১২ই মে
১৯১৯

নিবেদক।
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

সূচীপত্র

সৎপ্রসঙ্গ।

—:০:—

দেহ-বল।

"অন্নমূলং বলং পুংসাং বলমূলং হি জীবনম্।"

দেহবল মনুষ্যত্ব লাভের প্রথম সোপান, সকল সুখের মূল। একথা সকলেই জানেন, জানিলে কি হইবে! আমরা জানি এক রকম, করি অন্যরকম। চাই আরাম, পাই ব্যারাম। বঙ্গ সমাজে যাহারা উচ্চ শ্রেণীর লোক, তাহারা ও তদীয় সন্তানসন্ততিগণ দিন দিন স্বাস্থ্যহীন হইয়া দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছে; ইহা আমরা সকলেই অনুভব করিতেছি, কিন্তু কোন প্রতীকারচেষ্টা হইতেছে না। আমরা ছোট বড় সকলেই গড্ডলিকাপ্রবাহের ন্যায় কেবল স্বাস্থ্যনাশের পথে ধাবিত হইতেছি। কোন চিন্তা নাই, চেষ্টা নাই। বঙ্গসমাজ দুর্ব্বলতা বিষয়ে অদ্বিতীয়। পৃথিবীর কোন্ জাতি এত দুর্ব্বল, এত রুগ্ন? এ বিষয়ে পৃথিবীর কোন্ জাতি বাঙ্গালীর সমকক্ষ?

যেমন প্রাচীন বৃক্ষের ফল-পত্র হ্রস্ব-খর্ব্ব হইতে থাকে, সেইরূপ এই প্রাচীন বঙ্গসমাজ সকল বিষয়েই জীর্ণ শীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, এখন এই সমাজবৃক্ষের মূলোচ্ছেদ না করিয়া, যাহাতে জীর্ণ শীর্ণতা দূর হইয়া সজীবতা জন্মে, সে বিষয়ে সার্ব্বজনীন উদ্যম আবশ্যক।

বঙ্গসন্তানের দুর্ব্বলতার যে সকল কারণ পরিদৃষ্ট হয়, এ স্থলে তন্মধ্যে প্রধান কয়েকটীর উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) শারীরিক-শ্রমের অভাব। (২) স্বাস্থ্যপালনে অজ্ঞতা বা উপেক্ষা। (৩) খাদ্যের দুর্ল্লভতা। (৪) ইন্দ্রিয়ের অসংযম।

(১)
শারীরিক শ্রমের অভাব।

শ্রমজীবী ছোটলোক অপেক্ষা মসীজীবী ভদ্রলোকেরা অধিকতর ক্ষীণজীবী ও দুর্ব্বল। কেন? কারণ, ইহারা শারীরিকশ্রমে একান্ত অনভ্যস্ত ও অপটু। এমন সংস্কারও সমাজে বদ্ধমূল রহিয়াছে যে, শারীরিক শ্রমে ভদ্রলোকের ভদ্রতা থাকে না, মানসম্ভ্রম থাকে না। পরিশ্রম কেন ভদ্রলোকে করিবে? তাহ'লে ভদ্র ও ইতরে কি ইতরবিশেষ রহিল? ছোটলোকে আর ভদ্রলোকে কি প্রভেদ রহিল? এরূপ ধারণা যে সর্ব্বনাশের মূল! বড়লোকেরা এমন কি দরিদ্র ভদ্রলোকেরাও শ্রম-বিমুখ হইয়া রুগ্ন, দুর্ব্বল হইতেছেন এবং মান-মর্য্যাদা, ভদ্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সন্তানগুলিকে শ্রমপরাঙ্মুখ করিয়া তুলিতেছেন। ইহাতে তাহাদের যে স্বাস্থ্যভঙ্গ, দুর্ব্বলতা জন্মিতেছে তাহা ভাবেন না। আবার স্বর্ণকার, দোকানদার প্রভৃতি ব্যবসায়ীরা দোকানে প্রায় সারাদিন বসিয়া বসিয়া জড়প্রায় হইতেছে।

আমরা যদি বাহিরের দিকে একবার চক্ষু মেলিয়া দৃষ্টিপাত করি, তবে দেখিতে পাইব যে, পাশ্চাত্যজাতিসমূহের মধ্যে ভদ্র, অভদ্র, ধনী, নির্ধন, সকলেই শারীর-শ্রমের একান্ত পক্ষপাতী ও তাহাতে অভ্যস্ত, ইহাতে তাহাদের বিশেষ আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি। ইহারা নিয়মিত শারীরশ্রমজনক ব্যায়াম ও ক্রীড়া করিয়া সুস্থদেহে সুখে দীর্ঘ জীবন

যাপন করিতেছেন। ইহারা কেমন বলিষ্ঠ, দৃঢ়কায়, যেন, "ব্যূঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশু র্মহাভুজঃ।" ইহাদের বক্ষঃ বিশাল, স্কন্ধ বৃষের স্কন্ধের ন্যায় মাংসল, আকৃতি শালবৃক্ষের ন্যায় উন্নত, বাহু আজানু-লম্বিত। আর ভদ্রসন্তান আমরা, আমাদের অপ্রশস্ত বুক, কফের আধার; শিথিল স্থূল খর্ব্বকায়, ক্ষুদ্রবাহু, লম্বোদর! স্বদেশবাসী-দিগকে শালবৃক্ষের ন্যায় উন্নতকায় দেখিতে ও বর্ণনা করিতে ভারতীর বরপুত্র ভারতের প্রেমিক কবির কত গর্ব্ব ও আনন্দ হইত। ইংলণ্ডের কোন প্রেমিক কবিও গাহিয়াছেন—"The hearts of oak are our ships. The hearts of oak are our men." ওক্ বৃক্ষের সারে আমাদের জাহাজ, ওক্‌বৃক্ষের সারতুল্য আমাদের দেশবাসী। বাস্তবিক স্বদেশবাসী ওক্‌বৃক্ষের ন্যায় দৃঢ়কায় ও দৃঢ়মনা হইলে কোন্ প্রেমিক কবির মনে গর্ব্বমিশ্র আনন্দ না জন্মে? আমরা "শরীরং ব্যাধিমন্দিরম্" বচনটী স্মরণ করিতে করিতে নিজকে ও অপরকে আশ্বস্ত করিতেছি। শরীর থাকিলেই রোগ হইবে, রোগ লইয়াই সংসারে বিচরণ করিতে হইবে! সহ্যগুণ বড়গুণ! ব্যাধিটাকে বাঙালী যেমন জীবনের সহচর করিয়া লইয়াছে, এমন আর কে পারিয়াছে? এ বিষয়ে বাঙালী সকলকে জিতিয়াছে। আমরা ক্রমেই খর্ব্ব হইতে খর্ব্বতর হইতেছি, শেষে বুঝি বেগুনতলা হাট বসিবার কথা ফলে। লিলিপুসিয়ান্‌দের (Liliputian) কথা শুনিয়াছি, আমাদেরও বুঝি বা সেই খর্ব্বতা আসিয়া উপস্থিত হয়। এই জাতীয় দৈহিক খর্ব্বতা আমাদিগকে সকল বিষয়ে খর্ব্ব করিয়া তুলিবে। এই খর্ব্বতা লইয়া অন্যান্য সভ্যোন্নত জাতির সহিত পরীক্ষা ভিন্ন সর্ব্বপ্রকার প্রতিযোগিতায় উপহাস বই আর কি লাভ আছে?

ভদ্রসন্তানের শারীরিক শ্রমের বিধান কোন কালেই নাই; না বাল্যে, না যৌবনে, না বার্দ্ধক্যে। স্বাস্থ্য অটুট থাকিবে কি প্রকারে? বহু রোগের নিদান অজীর্ণরোগ ও বহুমূত্ররোগ এই উভয়ের সহিত বহু ভদ্রসন্তানের চিরদিনের জন্য প্রণয়-পরিচয় জন্মিয়া থাকে; কেন? শ্রমাভাবই ইহার প্রধান কারণ। চাকরি ব্যবসায়ী পুরুষ তবু চাকরির খাতিরে আফিসে ও আফিস হইতে বাড়ীতে যাওয়া আশা করেন, ইহাতে তাহার অঙ্গের একটু নাড়াচাড়া পড়ে, কিন্তু বঙ্গমহিলার কি দশা! বঙ্গীয় ভদ্রকুলরমণী ত গৃহপিঞ্জরে বর্দ্ধ বিহঙ্গিনী। গৃহ-পিঞ্জরে বদ্ধ হইয়াও শরীর খাটাইয়া অনেক গৃহকর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ইঁহাদের স্বাস্থ্যোন্নতিবিধায়ক কোন কাজকর্ম্মের ব্যবস্থা নাই। যাহা পূর্ব্বে ছিল, তাহা ক্রমে উঠিয়া যাইতেছে। প্রবাসীস্বামীর সহবাসে প্রবাসিনীরা শ্রমের কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক; ইচ্ছুক যাঁহারা, তাঁহারাও বড় সুযোগ পান না। যাঁহারা ধনী বা কিঞ্চিৎ উন্নতপদস্থ, তাঁহাদের কামিনীরা কোন কাজেই হাত দিতে চান না, দেন না। দাস দাসী পাচকের উপর গৃহকার্য্যের ভার। শ্রমাভাবে প্রকৃতির কঠোর নির্ম্মম শাসন পুরুষের ন্যায় রমণীর উপরও অপ্রতিহতভাবে চলিতেছে, সুতরাং উভয়েরই স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য শারীরশ্রমের সুব্যবস্থা থাকা উচিত, একথা বলিলে কেহ কেহ হয়ত আমাদের উপর বিষবাণ বর্ষণ করিবেন, কিন্তু তাহাদের মনে রাখা উচিত যে, পুরুষেরা নিজে শারীর শ্রমরূপ প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া যেমন অধর্ম্মাচরণ করিতেছেন, রমণীদিগকেও সেই শ্রমে বঞ্চিত রাখিয়া পাপের ভার দ্বিগুণ করিতেছেন। এ অবস্থার জন্য দায়ী কে? অবশ্যই শিক্ষিতসমাজ। শিক্ষিত-পুরুষমাত্রই ইহার জন্য

দায়ী। কারণ, তাঁহারাই অধিকতর দুর্ব্বল ও রুগ্ন হইয়া পড়িতেছেন। সমাজ বলিলে সাধারণতঃ যাহা বুঝা যায়, তাহা বড় দুর্ব্বল, সুতরাং তাহা ব্যক্তিগতভাবে প্রতিকারের ইচ্ছা ও চেষ্টা আবশ্যক। স্ত্রী-পুরুষ বলিষ্ঠ, সুস্থ না হইলে কখনও সন্তান বলিষ্ঠ ও পুষ্টাঙ্গ হইতে পারে না।

(২)

স্বাস্থ্যপালনে অজ্ঞতা বা উপেক্ষা।

যতই দিন যাইতেছে, যতই পৃথিবীর বয়স বাড়িতেছে, পৃথিবী ততই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে, আধুনিক পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের এই কথা শুনিয়া আমরা মনে করি, আমরাও উন্নতির পথে চলিয়াছি। কিন্তু স্বাস্থ্যবিষয়ে আমরা উন্নতির পথে না অবনতির পথে? অবনতির পথে যে চলিয়াছি, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ আছে কি? অনেকেই বোধ হয় সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত আছেন যে, তাহাদের পিতা, পিতামহ যেরূপ সবল সুস্থ ছিলেন, তাঁহারা নিজে সেরূপ নহেন, অনেক দুর্ব্বল, সন্তান আরও দুর্ব্বল। পিতা পিতামহ হয়ত জীবনে কোন দিন ঔষধ ব্যবহার করেন নাই, কিন্তু আজকাল ঔষধ, নিজের ও সন্তানগণের একটী নিত্য আহার্য্য বস্তু মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। প্রায় প্রতি পরিবার এক একটী ক্ষুদ্র হাসপাতাল হইয়া পড়িয়াছে। ডাক্তার কবিরাজ বাড়ীতে প্রায় প্রত্যহ আসিতেছেন, কত ঔষধসেবন, কত অর্থব্যয়, কত অশান্তি! কেন এমন হইল? এ দেশে অশিক্ষিতের সংখ্যা অত্যধিক; তাহারা ত স্বাস্থ্যের মূল্য কত, স্বাস্থ্যরক্ষা কাহাকে বলে জানেই না, জানিবার ইচ্ছাও রাখে না, কিন্তু যাহারা শিক্ষিত, তাহারাও স্বাস্থ্যের নিয়ম পালনে উপেক্ষা করিয়া

থাকেন ; না নিজের, না সন্তানগণের স্বাস্থ্য বজায় রাখিবার জন্য শারীর শ্রমাদির ব্যবস্থা করেন। বিদ্যার্থী বালকগণ অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষা পাইলেও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে গৃহে কোনরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হয় না, একথা বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। ভদ্র পরিবারে ব্যারাম হইলে চিকিৎসা হয় বটে, কিন্তু রোগ জন্মাইয়া রোগ প্রতীকারের চেষ্টা অপেক্ষা রোগ যাহাতে জন্মিতে না পারে, পূর্ব্বাহ্ণে সে বিষয়ে যত্নবান্ ও সাবধান হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য। কোন কোন রোগ চোরের মতন লুকাইয়া দেহ-গৃহে প্রবেশ করে।. কিন্তু গৃহস্থ সজাগ থাকিলে চোর আসিতে সাহস করে না।

বাঙালীর অনেক বিষয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য, উপেক্ষার ভাব দেখা যায়। ইহা কর্ত্তব্যজ্ঞানহীনতার পরিচায়ক, নিতান্ত অনিষ্টকর। স্বাস্থ্য রক্ষা করা, শরীরটাকে সবল করা যে কর্ত্তব্য, এ ধারণাই যেন আমাদের নাই। পিতা মাতা সন্তানদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়াই নিশ্চিন্ত, শিক্ষকগণও নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকগুলির পত্রছত্র পড়াইয়া ছাত্রের প্রতি দৈনিক কর্ত্তব্যের সমাধা করেন। স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখে কে? স্কুল কলেজের বালকবৃন্দ এই প্রবন্ধের বিশেষ লক্ষ্যস্থল। যাহারা শৈশব পার হইয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে, যাহাদের বসন্ত ঋতু সমাগত-প্রায়, তাহাদের বিবর্ণ মুখমণ্ডল, কোটরগত অক্ষি, ক্ষীণ দেহ-যষ্টি, ম্লানকান্তি দেখিয়া কোন্ সহৃদয় ব্যক্তির মনে নিদারুণ আঘাত না লাগে! সহৃদয় শিক্ষক মহাশয় হয়ত উপদেশ দিয়া থাকেন,— ছাত্রগণ! তোমরা কৃত্রিমদর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখিও না, উহা তোমাদিগকে প্রতারিত করিবে, প্রকৃত প্রতিরূপ দেখাইতে সমর্থ হইবে না। অকৃত্রিম মুকুরে তোমাদের নিজ নিজ দেহের অবস্থাটী

বুঝিতে চেষ্টা কর। যৌবনের কুহকে ভুলিয়া ভবিষ্যৎকে নিবিড় কালিমাময় করিও না; আত্মবঞ্চনা করিও না! স্বাস্থ্যের নিয়মাবলী সাধারণভাবে জানিয়া পালন করিতে বদ্ধ-পরিকর হও। বিলাতের স্কুলে ক্লাসের মধ্যে যে বালক পড়াশুনায় উৎকৃষ্ট, তাহা অপেক্ষা কুস্তিগীর (athletic) বালকের মান অধিক।* কারণ, "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্।" শরীরই ধর্ম্মের প্রথম সাধন। স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে, শরীর বলশালী হইলে, ধনবিদ্যা সকলই সুলভ হইতে পারে। তৈলভাণ্ডে ছিদ্র থাকিলে তৈল পড়িয়া যায়, দেহ-ভাণ্ডটাও টুটিয়া ফাটিয়া গেলে, মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের স্নেহ ঝরিয়া পড়িবে। কেবল বিদ্যালয়ের পরীক্ষা পাশ করাই জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য নহে। কর্ম্মক্ষেত্রে তোমাদিগকে অনেক পরীক্ষা পাশ করিতে হইবে। স্বাস্থ্যে জলাঞ্জলি দিয়া, শরীরটাকে মাটি করিয়া, কতকগুলি পাশ লইয়া, তোমরা জীবনে কি সুখ ভোগ করিবে? তোমরা শতবার শুনিয়াছ, সুখের মূল স্বাস্থ্য, উন্নতির মূল স্বাস্থ্য। তোমরা সুখ চাও, উন্নতি চাও সত্য, কিন্তু স্বাস্থ্যের অভাবে সুখ ও উন্নতি আকাশকুসুম। কিন্তু হায়! শিক্ষকমহাশয়ের এই কাতর-করুণ কথায় কে কর্ণপাত করে?

স্বাস্থ্যরক্ষার মূলসূত্র বিশুদ্ধতা। বিশুদ্ধ পানীয়, বিশুদ্ধ বায়ু, বিশুদ্ধ আহার, এবং বিশুদ্ধ দেহ ও মনের উপরই স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে।

* ইংরেজচরিত ২য় ভাগ। গিরিশচন্দ্র বসু।

(৩)

খাদ্য প্রভৃতির দুর্ল্লভতা।

পানীয়।

আমাদের প্রধান খাদ্য ভাত। ভাতে সার অতি অল্প। প্রথমতঃ ধান সিদ্ধ করিয়া চাউল তৈয়ার করিবার সময় কতকটা সার চলিয়া যায়, যে কিছু সার অবশিষ্ট থাকে, তাহাও রন্ধনকালে মাড়ের সঙ্গে বাহির হইয়া যায়। এক পোয়া চাউলে যদি আধ সের ভাত হয়, তবে চাউল এক পোয়া এবং জল এক পোয়া পাওয়া গেল। ইহাই ত আমাদের প্রধান আহার। দাল তরকারী প্রভৃতিতেও জলের ভাগ কম নহে। জলের এক নাম জীবন। ফলতঃ জল আমাদের জীবনই বটে। জলে স্নান, জল পান, আহারীয় দ্রব্যে জল, জল ভিন্ন আমাদের এক দিনও চলে না। সুতরাং জলটা খুব বিশুদ্ধ হওয়া আবশ্যক। অনেক পল্লীগ্রামে জলের অবস্থা দেখিলে চোখে জল আসে! ফাল্গুন চৈত্র মাসে পুকুরের জল প্রায় শুকিয়ে যায়, যা একটু কাদামাখা তপ্ত জল থাকে, তাহাতে একদিকে গরু বাছুর স্নান করিয়া জলের বিশুদ্ধতা সম্পাদন করে, অপর দিকে গ্রামের নরনারী দুপুরের রোদে স্নান করিয়া তৃপ্তি লাভ করে, এবং সেই জল পান করিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করে। নগরবাসীরা অনেক স্থলে, সুবিধা সত্ত্বেও সভ্যতার খাতিরে অবগাহন স্নান করেন না বটে, কিন্তু পল্লীবাসীরা হিতকর বিবেচনায় জলে নামিয়া স্নান করেন। আগে অনেক ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য পুণ্যকর্ম্ম বিবেচনায় জলাশয় খনন করাইয়া উৎসর্গ করিতেন, কিন্তু এখন

আর সে ধর্ম্মভাব নাই, এখন পুণ্যের স্রোত অন্য দিক্ দিয়া প্রবাহিত হইতেছে।

সুতরাং এইরূপ নূতন জলাশয় এখন আর বড় হইতেছে না। পুরাতন যা আছে, তাহাও সংস্কারাভাবে অব্যবহার্য্য। গ্রাম্য ধুরন্ধরগণ কাঁর নামে নালিশ করিবে, কার বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে, কার ধোপা নাপিত বন্ধ করিবে, কারে একঘ'রে করিবে, এই সব মহাব্যাপার নিয়া দিনরাত মহাব্যস্ত! জলাশয়সংস্কার তাহাদের কল্পনার ত্রিসীমায়ও আসে না। পাটোয়ারি বুদ্ধি ইহাদিগকে মাতব্বর করিয়াছে, তাই ইহারা নিজেকে বড় মনে করে; কিন্তু বোঝে না যে, ইহাদের জীবন পল্বলের ন্যায় পঙ্কিল, ক্ষুদ্র ও তপ্ত। সুখের বিষয় এই যে, সদাশয় গবর্ণমেণ্ট বা স্থানীয় বোর্ড জলকষ্ট নিবারণের জন্য নানা স্থানে জলাশয় খনন করাইয়া দিতেছেন।

জলের ন্যায় বায়ুও আমাদের প্রাণ। যোগিগণ প্রাণায়াম প্রভৃতি উপায়ে বাহিরের বিশুদ্ধবায়ু গ্রহণ করিয়া, ভিতরের অপবিত্র বায়ু বাহির করিয়া দিয়া, সুস্থ-সবল ও দীর্ঘজীবী হইতেন। বিশুদ্ধবায়ু আয়ুবৃদ্ধি করে, ইহা যে মহা উপকারী, প্রাণদ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অন্ন-জলের ন্যায় বায়ুও জীবন ধারণের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। বিশুদ্ধ বায়ুর একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহা যতই অধিক পরিমাণে অন্তঃস্থ কর না কেন, অসুখ হইবে না, বরং উপকারই হইবে। কিন্তু অন্নজল অতিরিক্ত মাত্রায় উদরস্থ করিলে উদরাধ্মান প্রভৃতি রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা। ঈশ্বরপ্রদত্ত এই সুবিধা ভোগ

করিতেও আমরা নারাজ! ধন্য আমাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি, ধন্য আমাদের উন্নতির আকাঙ্ক্ষা! অমিতভোজী পেটুকের দলও যথেচ্ছ বিশুদ্ধবায়ু গ্রহণে নিতান্ত অনিচ্ছুক। গ্রাম অপেক্ষা সহরে বিশুদ্ধবায়ু দুষ্প্রাপ্য। দুষ্প্রাপ্য হইলেও অন্নজলাদির ন্যায় নহে। জলের জন্য নগরবাসীর ট্যাক্স দিতে হয়, অর্থ ব্যয় করিতে হয়, কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ কাহারো বায়ু কিনিতে হয় না, ট্যাক্সও দিতে হয় না। বায়ু সর্ব্বত্র সর্ব্বদা আমাদের চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে। জলসমুদ্রে জলচর জীবের ন্যায় আমরা বায়ু-সমুদ্রে বিচরণ করি। কিন্তু সহরে লোকাধিক্য ও অন্যান্য কারণে বায়ু দূষিত হইয়া থাকে। বায়ুসেবনার্থ বিমলবায়ু-বহুল স্থানে প্রতিদিন নিয়মিতরূপে ভ্রমণ করা যে আবশ্যক একথা আমরা জানিয়াও জানি না, বুঝিয়াও বুঝি না। অর্থাভাববশতঃ উত্তম উপাদেয় অন্নজল সংস্থান না হইতে পারে, কিন্তু ইচ্ছা করিলেই ত আমরা বিনামূল্যে প্রাপ্য বিমল বায়ু ভোগ করিতে পারি, তাহাও আমরা করি না, কেন? অলসস্বভাবই ইহার প্রকৃত কারণ নহে কি?

আমাদের বাড়ীর চারিদিকের বায়ুকে যথাসাধ্য বিশুদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। বাসগৃহে নির্ম্মলবায়ু প্রচুর পরিমাণে প্রবেশ করিবার এবং গৃহাভ্যন্তরস্থ দূষিত বায়ু বহির্গত হইবার প্রশস্ত উপায় থাকা অবশ্যক। অধুনা টীনের ঘর আর্থিক উন্নতির প্রথম উল্লাস এবং তাহাতে বাস করা বিশেষ সুবিধাজনক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। ধনীর ইষ্টকালয় ত উত্তমই বটে, কিন্তু দীনের পর্ণকুটীরও টিনের ঘর অপেক্ষা স্বাস্থ্যকর। গ্রীষ্মকালে দুপুরের রোদে ডজন খানেক টিনের ঘর লইয়া এক একখান বাড়ী যেন এক একটী অগ্নিকুণ্ড! তত্রত্য নিশ্চল স্তিমিত বায়ু যেন অগ্নিকণা বর্ষণ করিতে

থাকে। তখন কি ঘরে, কি বাহিরে, কোথাও তিষ্ঠিতে পারা যায় না। প্রাণ আইঢাই করে। গৃহ-ছাদের তাপ, তালু ভেদ করিয়া সমগ্র মাথাটাকে সমস্ত দিনরাত গরম করিয়া রাখে। টিনের ঘরের অপকারিতার এই প্রকার জ্বলন্ত প্রমাণ পাইয়াও উহাতে বাস করিতে কি ধনী, কি গরিব সকলেরই কেমন একটা জীবন্ত উৎসাহ ও আগ্রহ দেখা যায়। এই বৈজ্ঞানিকযুগে প্রত্যক্ষ প্রমাণের অত্যধিক সমাদর, কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ প্রমাণকেও কেমন আগ্রহের সহিত উপেক্ষা করি! শরীর দগ্ধ হয়, মন তাহা বিশ্বাস করে না। খড়ের ঘর অপেক্ষা টিনের ঘরে বাস করা কোন কোন বিষয়ে সুবিধা আছে বটে, কিন্তু স্বাস্থ্যের কাছে অন্য কোন কারণই বলবৎ হইতে পারে না।

আহার।

খুব খাও আর হজম কর, শরীর ভাল থাকিবে। অবশ্য ভাল জিনিষই খাইতে হইবে, এবং ভাল করিয়া হজম করিতে হইবে। শারীরিক পরিশ্রম না করিলে ভুক্তদ্রব্য ভালরূপ হজম হয় না, ক্ষুধা জন্মে না। অক্ষুধায় অমৃতও গরল, ক্ষুধায় গরলও অমৃত। আমাদের অস্থি-মাংস-শুক্র-শোণিত-সমন্বিত শরীরটা ভুক্তদ্রব্যের পরিণতি। সুতরাং ভক্ষ্য দ্রব্যের প্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। কিন্তু ভাল খাটি জিনিষ ত আজকাল দুর্লভ হইয়াছে।

খাদ্যদ্রব্যের উপর যেরূপ অত্যাচার ও কৃত্রিমতা চলিয়াছে, এমন আর কিছুতেই দেখা যায় না। গব্য জিনিষ, যথা টাট্‌কা গাওয়া ঘি, বিশুদ্ধ গাওয়া দুধ, অতি উপাদেয় ও বলকারক। "ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।" টাকা না থাকে, ঋণ করিয়া ঘি খাও। অবশ্য

ঋণ করিবার উপদেশটা অনুমোদনীয় নহে, তবে. এ কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য এই যে, যেরূপেই হউক ঘি খাইতেই হইবে, ঘির মতন এমন উপকারী, ওজোবলবৃদ্ধিকারক এবং মস্তিষ্ক ও শরীরের পরিপোষক আর দ্বিতীয় পদার্থ নাই বলিলেই হয়। বিশুদ্ধ গাওয়া ঘি খাওয়া চাই, কিন্তু কোথায় পাই? অনেক সহরেই ত খাঁটি দুধ পাওয়া যায় না, পাওয়া যায়—নালা ডোবার জল মিশান কিংবা বাসি দুধ। গাওয়া ঘি পাওয়া যায় না, পাওয়া যায়—চর্ব্বিমিশ্রিত ভেজাল ঘি। তারপর মাছ তরকারি, তাহাও পূর্ব্বের ন্যায় সুলভ নহে, অত্যন্ত দুর্ম্মূল্য। দুর্ম্মূল্য হইলেই অর্থাভাববশতঃ বাধ্য হইয়া আহারের মাত্রা কমাইয়া দিতে হয়। বাঙালী কি খায়, কি খাইয়া বাঁচে? আমাদের সে দিকে বড় একটা দৃষ্টি নাই, খাওয়াটা যেরূপই হউক না কেন, তাহা কে দেখিতে আসে? দুধ ঘি যেমন তেমন হইলেই হইল, না হয় নাই বা হইল, কিন্তু পোষাকটা ভাল হওয়া চাই। দামী জুতা, রেশমীচাদর, চেইন ঘড়ি, ছড়ি, এ সব চাই, এ না হইলে ভদ্রতা রক্ষা হয় কৈ? পরিধানে ফিন্‌ফিনে ধুতি ও নাকে চশমা লইয়া বাবু সাজিয়া, বায়ুর আগে হেলিয়া দুলিয়া দু'চারি গজ বেড়াইয়া বেড়াইলে প্রথম যৌবনের সার্থকতা হয় না কি?

পাঠ্যাবস্থায় বালককাল হইতে বাঙালীর অল্পাহারে অভ্যাস, অল্পাহার করিতে করিতে পেট যেন মরিয়া যায়, শেষে আর পুষ্টিকর জিনিষ উদরস্থ হইতে চায় না, ঘি সহ্য হয় না, খাইলেই অজীর্ণরোগ আসিয়া উপস্থিত হয়। আক্‌বরের প্রিয় সচিব আবুলফজলের দৈনিক আহারের পরিমাণ প্রায় অর্দ্ধ মণ ছিল। রামমোহন রায়ও কাবুলী

দিগের ন্যায় একটা পাঁটা খাইয়া অনায়াসে জীর্ণ করিতে পারিতেন। শরীরে বলও তেমনি ছিল। একদিকে প্রতিভা-বহ্নি, অপর দিকে জঠর-বহ্নি উভয়েরই বলে অক্লান্ত পরিশ্রমে তিনি সমাজ সংস্কারকার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে,—যে বয়সে আজকাল আমাদের অনেককেই জরা আসিয়া আক্রমণ করে ও অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলে। ইঁহাদের খাদ্যের পরিমাণের সহিত আমাদের খাদ্যের পরিমাণ তুলনা করিলে, আমরা একপ্রকার অনাহারে আছি বলা যাইতে পারে। "প্রত্যেক ইংলণ্ডবাসী গড়ে প্রতিবৎসর ৬০০৲ টাকার খাদ্যদ্রব্য আহার করিয়া থাকে। ভারতবাসী ২০৲ টাকার দ্রব্যও আহার করে কি না সন্দেহ"।* আবার যাহা খাই, তাহাও জীর্ণ করিতে পারি না। অজীর্ণ অন্ন দেহের বিষম শত্রু, সুজীর্ণ অন্ন পরম বন্ধু। সুজীর্ণ অন্নই রক্তরসে পরিণত হইয়া দেহকে রক্ষা করে, দেহের বল বৃদ্ধি করে। অন্নের সুপরিপাক ও ক্ষুধাবৃদ্ধির জন্য শারীরিক শ্রম একান্ত আবশ্যক, কবিরাজের পরিপাকের বড়ি অপেক্ষাও অনেক উপকারী। আমাদের বুদ্ধিমান্ মন এ কথা বিশ্বাস করে, কিন্তু অচল দেহটা কিছুতেই এ কথায় সায় দেয় না।

মিষ্টান্ন—বালকেরা সাধারণতঃ মিষ্টান্ন-প্রিয়। মিঠাই খাইতে তাহারা বড় ভালবাসে। ময়রারাও করুণহৃদয় পতিত-পাবন। মুদির দোকানে যে ময়দা ঘি বিকায় না, ময়রারা দয়াপরবশ হইয়া তাহা সুলভমূল্যে কিনিয়া উপাদেয় মিঠাই তৈয়ার করে। ফেরিওয়ালারাও লালমোহন, ক্ষীরমোহন সাজাইয়া সরলচিত্ত বালকদিগের মন ভুলাইয়া

---

* সঞ্জীবনী ১৫ ফাল্গুন, ১৩১৯ সাল।

রসনার তৃপ্তিসাধনে একান্ত যত্নবান্। এই গুলির নাম মিষ্টান্ন না রাখিয়া বিষান্ন রাখাই সঙ্গত।

ইহাতে যেমন অর্থের তেমনি স্বাস্থ্যের হানি হইয়া থাকে। কেবল রসনার লাম্পট্য বৃদ্ধি পায় মাত্র। এরূপ মিষ্টান্ন না খাওয়া সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়ঃ, এ কথায় বালকদিগের ক্রোধঃ হইবে বটে, কিন্তু ভাবিয়া দেখা উচিত, মিঠাই খাইলে বল বাড়ে কি না, উপকার আছে কি না। যাহাতে বলহানি হয়, তাহা লোভনীয় হইলেও সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। আমাদের আদর্শস্থানীয় পাশ্চাত্যসভ্য-দেশবাসীরা ত এইরূপ মিষ্টান্নপ্রিয় নহেন। পয়সা ব্যয় করিয়া ব্যারাম কিনিয়া লওয়া নিতান্ত নির্ব্বোধের কর্ম্ম নয় কি?

পূর্ব্বে অনেক খাদ্যদ্রব্যই ঘরে তৈয়ার হইত। গো-পালন গৃহস্থের ধর্ম্ম ছিল। নানাবিধ উপাদেয় গব্য জিনিষ গৃহে তৈয়ার হইত। সেই সব সদ্যঃ-পবিত্র দ্রব্য আহার করিয়া মনের তৃপ্তি ও দেহের স্বাচ্ছন্দ্য জন্মিত। বাড়ীতে ধান ভানিয়া টাট্‌কা চাউল প্রস্তুত করা হইত, তাহাতে অম্লরোগের প্রাবল্য দেখা যাইত না, কিন্তু এখন আমরা বিলাসিতায় মজিয়াছি। পরের হাতে সব সঁপিয়া দিয়াছি। অন্যে আমাদের জন্য পরিশ্রম করিয়া অন্ন প্রস্তুত করিয়া দিবে, আমরা সুখে অনায়াসে বসিয়া তাহা ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিব ও স্বাস্থ্য বজায় রাখিব।

বঙ্গদেশের হোটেলগুলি অপবিত্রতার আধার। কোন কোন হোটেল সর্ব্বজনবিদিত। এই সকল হোটেলের যথাযথ বর্ণনা দ্বারা বীভৎস রসের অবতারণা করা সুরুচিসঙ্গত নহে, তবে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এখানে মূর্ত্তিমতী অপবিত্রতা পিশাচী প্রতিদিন

কত যাত্রী অতিথিদিগকে সাদর সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিয়া থাকে! এবং হোটেলের অর্থগৃধ্নু পাণ্ডারাও প্রতিদিন সেই পিশাচীর পূজা করিয়া কত ধন উপার্জ্জন করিয়া থাকে।

অল্পভোজন ও অতিভোজন উভয়ই বলহানিকারক, সুতরাং অধর্ম্ম। ধর্ম্মের অনুরোধে কেহ কেহ, কখন কখন, অনশনে উপবাসে শরীরকে ক্লেশ দিয়া দুর্ব্বলতাকে ডাকিয়া আনেন, কিন্তু ইহা যে অধর্ম্ম, তাহা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন,—

কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্॥

অর্থাৎ ধর্ম্মবোধে যে সকল বিবেকহীন লোক বৃথা উপবাসাদি-দ্বারা অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে কৃশ সুতরাং অন্তরস্থ আত্মাকে ক্লেশ দিয়া অশাস্ত্রবিহিত তপশ্চরণাদি করে, তাহাদিগের সঙ্কল্প আসুরিক বলিয়া জানিবে। পর্ব্বে পর্ব্বে, সময়ে সময়ে, লঘুভোজন বা উপবাস স্বাস্থ্যের পক্ষে উপকারী, কিন্তু বৃথা উপবাসে শরীরের দুর্ব্বলতা ও স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে তাহা নিশ্চয়ই অধর্ম্ম।

আবার আহারের নিমন্ত্রণ হইলেই লোকে অসময়ে গুরুভোজন করিয়া থাকে। অনিয়মই বাঙ্গালীর নিয়ম। নিমন্ত্রণ ব্যাপারেও সেই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে না। অসময়ে ভোজন, অপরিমাণ ভোজন, নিমন্ত্রণ হইলেই একথা বুঝিতে হইবে। কেহ কেহ এই সুযোগে উদরটাকে দ্বিগুণ ত্রিগুণ বোঝাই করিয়া লয়! কেহবা ভরা পেটে গণ্ডায় গণ্ডায় রসগোল্লা গলাধঃকরণ করিয়া কত বাহবা পায়! ঐ যে কথায় বলে, "খাইলে দামোদর, না খাইলে শ্রীধর।" ইহাদেরও সেই দশা। ইহারা নিজ বাড়ীতে শ্রীধর, উদরের থ'লেটাকে খুব

ক'সে বেঁধে রাখেন, আর নিমন্ত্রণের বাড়ীতে দামোদর, কোমরের বাঁধ ও উদরের থ'লের বাঁধ খুলে দিয়ে বসেন। বৃকোদর বৃকের উদর পাইয়াছিলেন বলিয়াই সশরীরে স্বর্গে যাইতে পারেন নাই, এই কথাটা ভোজনসর্ব্বস্ব পেটুকদলের মনে জাগে কিনা জানি না। ভোজন বলের জন্য, শরীর-রক্ষার জন্য। জীবনের জন্যই ভোজন, ভোজনের জন্য জীবন নহে, এই মোটা কথাটাতেই কেমন ভুল!

আজকাল প্রায় সকল প্রকার খাদ্যদ্রব্যই দুর্ল্লভ, দুর্ম্মূল্য ও কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ইহাতেও আমাদের মনে হা-হুতাশের ভাব নাই, একেবারে নির্ব্বিকার। ইহা কি জড়ত্বের লক্ষণ নহে? খাঁটি জিনিষ আজকাল দুষ্প্রাপ্য, ইহার অর্থ এই যে, খাঁটি মানুষও দুষ্প্রাপ্য। বিক্রেতাগণ কৃত্রিম-জিনিষ বিক্রী করে, ক্রেতাগণ অম্লানবদনে তাহা গ্রহণ করিয়া মৌন অনুমোদন বা সম্মতি প্রদান করিয়া কৃত্রিমতার প্রশ্রয় দিয়া আসিতেছেন, সত্যের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেছেন। ইহাতে নৈতিক-বায়ু দূষিত, জাতীয়-চরিত্র সত্যভ্রষ্ট হইয়া পড়িতেছে। একত্র অবস্থানহেতু কৃত্রিম পোষ্য-পুত্রের প্রতি কৃত্রিম-পিতার একটা কৃত্রিম-স্নেহ জন্মে, এবং পুত্র জন্মিল না বলিয়া তাহার আর মনে দুঃখ থাকে না। সেইরূপ নিত্যব্যবহারে কৃত্রিম জিনিষের উপর লোকের একটা কৃত্রিম-ভালবাসা আসে, এবং আসল জিনিষের অভাববোধ ক্রমে চলিয়া যায়। এই প্রকারে পণ্য-দ্রব্যে ও লোকচিত্তে কৃত্রিমতা প্রশ্রয় পাইয়া থাকে। কৃত্রিম জিনিষের কাটতি বিলক্ষণ, ইহাতে প্রমাণ হইতেছে যে, এই প্রকার ক্রেতা কি বিক্রেতা কেহই খাঁটি মানুষ নহে। ক্রেতা যদি খাঁটি মানুষ হইবেন, তবে তিনি কেন কৃত্রিম জিনিষ গ্রহণ করিবেন? সত্যের প্রতি যাঁহার অনুরাগ আছে,

তিনি কি কখনও সত্যের অপলাপ সহ্য করিতে পারেন? বিক্রেতাও ছল ও মিথ্যা ব্যবহারদ্বারা দুপয়সা বেশ অর্জ্জন করিতেছে। এই প্রকারে কৃত্রিমতা সমাজে সজোরে চলিতেছে। খাঁটি জিনিষ সন্ধান করিতে গেলেই সন্দেহ আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রতিদিন এইরূপ দৃষ্টান্ত বালকদিগের নয়নগোচর হয়। সন্দেহ, অসত্য ও কৃত্রিমতাতে তাহারাও অভ্যস্ত হইতে থাকে। ইহাতে জাতীয় চরিত্র বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত। খাদ্যাদিদ্রব্যে কৃত্রিমতা ও কদর্য্যতার জন্য কেবল বিক্রেতা নহে, ক্রেতাও দায়ী। ক্রেতা যদি কৃত্রিম অনুপাদেয় দ্রব্য ক্রয় না করেন, তবে বিক্রেতার নিকট ঐ প্রকার জিনিষ পাওয়া যাইবে না।

জলমিশ্র দুগ্ধ যদি কেহই খরিদ না করে, তবে কোন্ দুগ্ধবিক্রেয়ী দুধে জল দিতে সাহস করিবে? ব্যাবসায়ীরা হিসাবী লোক, তাহারা কিছুতেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে ইচ্ছুক নহে। চর্ব্বিমিশ্রিত কদর্য্য ঘি, সাতদিনের বাসি মিঠাই, পাঁচ দিনের পচা মাছের গ্রাহক যদি না জোটে, তবে কি বাজারে, দোকানে ঐরূপ জিনিষ বিক্রয়ার্থ উপনীত হইবে? আমরা যাহা চাই, যেরূপ দ্রব্যে আমাদের রুচি, দোকানদারেরা আমাদের জন্য তাহাই উপস্থিত করে। আমরা সকলেই যদি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া কৃত্রিম কদর্য্য জিনিষ ব্যবহার না করি, কৃত্রিমতা কয়দিন থাকিতে পারে? কোন সভ্যদেশে ভোজ্যদ্রব্যে এইরূপ কৃত্রিমতা ও কদর্য্যতা আছে কি না জানি না।

দেহ ও মনশুদ্ধি।

বাসভবন, আসন-বসন, এই সব যেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা আবশ্যক, সেইরূপ দেহকেও পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। কিন্তু বিলাসি-

তার সংশ্রব রাখা চাই না। দন্ত, কেশ, নখ, চর্ম্ম প্রভৃতি পরিষ্কার রাখিতে হইবে, কিন্তু অনাবশ্যকরূপে নানা প্রকারের সৌখিন দ্রব্যে আসক্তি, যুবকদিগের পক্ষে নিতান্ত অনিষ্টকর। ইহাতে যে কেবল অর্থের অপব্যবহার হয় এমন নহে, মনটাও তরল, চঞ্চল ও লঘু হইতে থাকে। বিদ্যার্থীর পক্ষে বিলাসিতা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়, নচেৎ জ্ঞানার্জ্জনে বিঘ্ন ঘটিয়া থাকে।

দেহের ন্যায় মনটাকেও নির্ম্মল, পবিত্র রাখিতে হইবে। মনকে বিশুদ্ধ রাখার অর্থ এই যে, ইহাকে কামক্রোধাদির আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে হইবে। কামক্রোধ অন্তরে মল জন্মায়। কাম, মনের চাঞ্চল্য ও কুৎসিত ভাব আনয়ন করে। কোপনস্বভাব ব্যক্তির মনে, সুতরাং দেহে, স্বাচ্ছন্দ্য থাকিতে পারে না। ক্রোধের উষ্মা, দেহ, মন ও মস্তিষ্ককে উষ্ণ করিয়া রাখে। সুনিদ্রার ন্যায় চিত্তের প্রফুল্লতা স্বাস্থ্যের লক্ষণ। কিন্তু কাম-ক্রোধ এই দুইটীকেই হরণ করে।

(৪)

ইন্দ্রিয়ের অসংযম।

ইন্দ্রিয় সংযত না হইলে কেবলই বিপদ্। যথেচ্ছ ব্যবহারে ইন্দ্রিয় ক্রমশঃ নিস্তেজ, শক্তিহীন, সঙ্গে সঙ্গে দেহও শক্তিহীন হইয়া পড়ে। দুর্ব্বলতা রোগের সহায়, রোগ দুর্ব্বলতার সহায়। দুর্ব্বলহৃদয় কামক্রোধাদির প্রিয়নিকেতন, বীরহৃদয়ে উহারা বড় একটা স্থান পায় না। কাম নিজে দুর্ব্বল হইলেও দুর্ব্বলচিত্তে অত্যন্ত বল প্রকাশ করে। অতএব কামরিপুকে বশীভূত করা সর্ব্বপ্রযত্নে কর্ত্তব্য। এই জন্যই পুরাকালে আর্য্যসমাজে ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা ছিল। ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্যপালন একান্ত আবশ্যকীয়।

এই হিতকর প্রথার পুনঃ প্রবর্ত্তন করিলে ছাত্রদের সুতরাং দেশের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। ব্রহ্মচর্য্য শব্দের সঙ্কীর্ণ অর্থ "অবিবাহিতাবস্থা" (celibacy) পরিত্যাগ করিয়া সাধারণতঃ "ইন্দ্রিয়-সংযম"ই প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে। অসংযত বলবান্ অশ্ব যেমন আরোহীকে বিপথে লইয়া যায়, যৌবনকালে প্রবল ইন্দ্রিয়সকল সেইরূপ তরলমতি যুবকদিগকে কুপথে চালাইতে প্রয়াস পায়। সুতরাং সংযম্ শিক্ষা আবশ্যক। কিন্তু ইহা ত সহজ কথা নয়। চক্ষু কর্ণ, রসনা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গুলিকে বশে আনিতে হইবে, কামক্রোধাদি রিপুগুলিকে দমন করিতে হইবে, এইরূপ মৌখিক উপদেশ দিলেই কোন কাজ হইবে না, ইন্দ্রিয়সংযম হইবে না। বাল্যকাল হইতে সংযমী চরিত্রবান্ শিক্ষকের দীর্ঘকালব্যাপী ক্রমাগত শিক্ষা ও শাসনের অধীন থাকিয়া সংযম অভ্যাস করা আবশ্যক। নিয়মিতরূপে অন্তর্দেহের ড্রিল হওয়া দরকার।

স্বভাবতঃ কুদৃশ্য দেখিতে অবশী যুবগণের নয়ন ধাবিত, কুসঙ্গীত শ্রবণে কর্ণ আকুলিত, কুকথা বলিতে রসনা লালায়িত। আদিরসাশ্রিত কুৎসিত সঙ্গীত ও কুৎসিত নাট্যাভিনয়ের পরিবর্ত্তে, প্রায়শঃ মধুর ধর্ম্ম-সঙ্গীত শ্রবণ, নদী, পর্ব্বত প্রভৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী, সে সকলের মনোহর চিত্র ও মহাত্মাদিগের মধুর-পুণ্য আলেখ্য, দর্শন করিলে, তাহাদের দর্শন ও শ্রবণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত এবং চিত্ত প্রফুল্ল-পবিত্র হইতে পারে।

ছাত্রদিগের মধ্যে বহ্বালাপপ্রবৃত্তি অতিশয় বলবতী। ইহা চিত্তকে লঘু করে। আর বহুভাষী জনে প্রায় সত্যকথা কয় না। সত্যে অনুরাগ থাকিলেও বহুভাষী ব্যক্তি সত্যকথা প্রায়ই বলিতে

পারে না; কারণ সত্যকথা যে অল্পেই ফুরাইয়া যায়। বাক্‌সংযম চরিত্রগঠনের পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী; ইহাতে মনের বল বৃদ্ধি হয়। আমরা বাক্‌সিদ্ধ পুরুষের কথা শুনিয়াছি। বাস্তবিক বাক্‌সিদ্ধি ও সত্যভাষণ বাক্‌সংযমেরই পরিণতি। অসৎপ্রবৃত্তির দমন ও সৎপ্রবৃত্তির স্ফুরণ সংযমের ফল। ইহাতে দেহ ও ইন্দ্রিয়ের শক্তি সঞ্চিত হয়। বলসঞ্চয় অর্থাৎ দেহ, মন ও চরিত্রের বল বৃদ্ধি করাই সংযমের উদ্দেশ্য। বলের জন্যই বাক্‌দণ্ড, মনোদণ্ড ও কায়দণ্ড এই ত্রিদণ্ডের ব্যবস্থা প্রাচীন যুগে ছাত্রসমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সংযমের অভাব, দৈহিক ও মানসিক দুর্ব্বলতার বিশিষ্ট কারণ।

দৈহিক দুর্ব্বলতার যে সকল মূল কারণ সমাজে বদ্ধমূল হইয়া রহিয়াছে, তাহা উন্মূলিত করিয়া, বলশালী হইবার জন্য সার্ব্বজনীন চেষ্টা আবশ্যক। দৈহিকবলের অভাবে কোন প্রকার উন্নতিই সুলভ নহে। যদি আমরা কোন প্রকারের উন্নতি কামনা করি, যদি সমাজের মঙ্গল ইচ্ছা করি, তবে আপামর সর্ব্বসাধারণের শারীরিক উন্নতিবিধান সর্ব্বাগ্রে একান্ত আবশ্যক। শারীরিক দুর্ব্বলতা সকল প্রকার দুর্ব্বলতার মূল কারণ। শরীরের সহিত মনের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। শরীর সুস্থ থাকিলে মনটাও সুস্থ-সবল, প্রফুল্ল-সরল হইতে পারে। দুর্ব্বলদেহে মনটাও প্রায়শঃ দুর্ব্বল। জলের ন্যায় দুর্ব্বল মনের গতি নিম্ন দিকে। এই গতিটাকে ফিরাইতে হইলে দেহের বল বৃদ্ধি আবশ্যক।

ধন-বল।

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ ॥"

লক্ষ্মী ধনের অধিষ্ঠাত্রীদেবী। লক্ষ্মীদেবীর আরাধনা কর, ধনাগম হইবে, এরূপ উপদেশের পাত্র কোথায়? সকলেই ত অর্থ চিন্তায় ব্যাকুল, সকলেই ত টাকা টাকা করিয়া সারাদিন ছুটাছুটী করিতেছে। যে জ্ঞান চায় না, ধর্ম্ম চায় না, সেও ধন চায়; যে মান-সম্ভ্রম চায় না, সেও ধন চায়। ছোট বড়, যুবা বৃদ্ধ, জ্ঞানী মূর্খ সকলেই ধন চায়। সকল দেশে সকল লোকই ধনার্থী।

ধনের আদর পূর্ব্বেও ছিল, এখনও আছে। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে, সভ্যতার উন্নতিতে, ধনের অভাববোধ ও প্রয়োজনীয়তা পূর্ব্বাপেক্ষা শতগুণে বাড়িয়াছে। "অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং, নাস্তি ততঃ সুখ-লেশঃ সত্যম্।" অর্থকে সর্ব্বদা অনর্থ বলিয়া ভাবিবে, অর্থে সত্য-সত্যই সুখের লেশমাত্র নাই। জ্ঞানবাদী সন্ন্যাসীর এই উপদেশ এখন কোন্ সংসারী মানিতে পারে? মানিলে সংসার চলে কৈ? অর্থ চাই, বিত্তবিভব চাই। পারিবারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্য, সমাজের শ্রীবৃদ্ধি, এমন কি, অস্তিত্বও বহুল পরিমাণে অর্থের উপর নির্ভর করে। ধনে ব্যক্তির ততোধিক সমাজের বলবৃদ্ধি হইয়া থাকে। জ্ঞানের ন্যায় ধন একটী শক্তি। দরিদ্র ব্যক্তি ও দরিদ্রসমাজ জীবন্মৃত। দরিদ্রতা বল ও গুণ হরণ করে। "দারিদ্র্যদোষো গুণ-রাশিনাশী।" একমাত্র দারিদ্র্যদোষই সমস্ত গুণরাশিকে বিনষ্ট করে। এ কথা সত্য। দরিদ্র ব্যক্তি ধনীর নিকট হেয়, দরিদ্র সমাজ ধন-গর্ব্বিত সমাজের নিকট উপহাসাস্পদ।

গৃহী মাত্রেরই ধনের প্রয়োজন আছে সত্য, কিন্তু ধনাগমের পথ অনেকে পায় না। বাণিজ্য ও কৃষি ধনাগমের প্রকৃষ্ট ও প্রশস্ত পথ একথা প্রাচীনকালের লোকেরাও বিলক্ষণ জানিতেন। কেবল যে জানিতেন তা নয়, তাঁহারা বাণিজ্যকার্য্যে বিশেষভাবে লিপ্ত ছিলেন। এক সময়ে তাম্রলিপ্ত (তম্‌লুক) বাণিজ্যের প্রধান বন্দর ছিল। বাঙালী-হিন্দুনাবিক-পরিচালিত বাঙালীর তাৎকালিক অর্ণবযানসমূহ বাণিজ্যার্থে সগর্ব্বে সমুদ্রবক্ষে বিচরণকরতঃ, দূরবিদেশ হইতে ধনরত্ন আহরণ করিয়া স্বদেশকে ধনশালী করিয়াছিল, ইহা ঐতিহাসিক সত্য। য়ুরোপীয় সভ্যজাতিসমূহ আমাদের প্রায় সকল বিষয়েই পথ-প্রদর্শক। ইহারা বাণিজ্যের প্রভাবে নিজ নিজ দেশে জগৎ শেঠের ন্যায় ধনকুবেরের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছে ইহা জানিয়াও, এবং অবাধ-বাণিজ্যপ্রথা বর্ত্তমান থাকাতেও, বাণিজ্যবিষয়ে পাশ্চাত্য সভ্যজাতির অনুসরণ করিতে আমাদের সাহস হয় না। আমরা অর্থাগমের সর্ব্ব নিকৃষ্ট দুইটী উপায়—চাকরি ও ভিক্ষা—বাছিয়া লইয়াছি। অলস শান্তিপ্রিয়তাই ইহার অন্যতম কারণ। মাসান্তে বিনা ঝঞ্ঝাটে বেতনের নির্দ্দিষ্ট টাকা কয়টী পাওয়া যায়, কেমন সহজ পন্থা!

বাঙালী চাকরি করে, কিন্তু অভাব ঘোচে না। বৎসর বৎসর কত যুবক চাকরির জন্য প্রস্তুত হইতেছে, কিন্তু সকলকে চাকরি দিবে কে? কাজেই অর্থার্জ্জনের উপায়ান্তর খুঁজিয়া লওয়া আবশ্যক। কিন্তু তাহার চেষ্টা কয় জনে করে? কাজেই দুঃখ দারিদ্র্যও দূর হয় না।

আয়ের দ্বার যদি এক, ব্যয়ের দ্বার একশত। অর্থ এক দিক

দিয়া আসে, কিন্তু শতভাবে শতদিক্ দিয়া বাহির হইয়া যায়। আয়ের অনুপাত অতিক্রম করিয়া ব্যয়বৃদ্ধি হইলেই দারিদ্র্য আসিবে। চাকরিগতপ্রাণ বাঙালী-ভদ্রসন্তানের মধ্যে কেহ কেহ ঋণজালে জড়িত, কাহারো বা আয়-ব্যয় সমান। সঞ্চয় করা অতি অল্প লোকের ভাগ্যে ঘটে। খাদ্য, পরিধেয় প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য এত অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, সামান্য চাকরীর আয়ে আর আবশ্যকীয় ব্যয় সঙ্কুলন হইতে পারে না। তাহাতে আবার অনেক কৃত্রিম কল্পিত অভাব আসিয়া ব্যয়ের মাত্রা দ্বিগুণ, ত্রিগুণ করিয়া তুলিয়াছে। অভাবে কত লোকের স্বভাব নষ্ট হইয়া যাইতেছে। আমাদের অভাব দিন দিন বাড়িতেছে, অভাবের অভাব নাই, কিন্তু অভাব-মোচনের সমবেত সবল চেষ্টার একান্ত অভাব। ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র দৈনন্দিন অভাবের তাড়নায় ব্যথিত-অন্ধ আমরা, বড় বড় অভাবগুলি একেবারেই দেখিতে পাই না।

বঙ্গদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। নদীমেখলা বঙ্গভূমি, স্বভাবতঃই উর্ব্বরা, শস্যশ্যামলা। ইহা প্রকৃতি দেবীর স্নিগ্ধ-কোমল-হস্ত-নির্ম্মিত, ফলশস্যশোভিত ভারত-উদ্যান। এখানে স্বল্পায়াসে যেরূপ প্রচুর শস্য জন্মে, অন্যত্র বহু পরিশ্রমেও তাহা দুর্ল্লভ। তথাপি কত কৃষক অন্নাভাবে কষ্ট পাইতেছে। বঙ্গের ক্ষেত্র সকল, বঙ্গের অধিবাসী-দিগকে জীবনধারণার্থ পর্য্যাপ্ত শস্য প্রদান করিতে পারে; তথাপি অন্নকষ্ট কেন? কৃষকের দোষে এ অবস্থা না হইলেও, কৃষির অনুন্নতি ইহার কারণ না হইলেও, কৃষির উন্নতিবিধানে যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক, একথা কে অস্বীকার করিবে? কৃষিজাত শস্যই মানবের জীবন; সেই শস্যের উৎপাদনে নিরক্ষর কৃষক নিযুক্ত।

ভদ্র শিক্ষিতগণ কৃষককুলের শ্রমজাত ফলভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত। ফলতঃ কৃষিকার্য্যে শিক্ষিতদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইলে প্রচুর সুফল ফলিতে পারে।

বাণিজ্যের মূলে কৃষি ও শিল্প। পূর্ব্বে ঢাকাই মস্‌লীন প্রভৃতি শিল্পজাত দ্রব্য সুদূরদেশে প্রেরিত হইত, দেশে ধনাগম হইত। এখন সেই সব শিল্প লুপ্তপ্রায়। এখন বঙ্গদেশে এমন শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন হয় না, যাহা বিদেশে বিক্রীত হইবার উপযুক্ত। কৃষিদ্রব্যই এখন বিদেশে রপ্তানী হইতেছে। মাড়ওয়ারী ও পারসীজাতি বাণিজ্যপ্রিয়, তাহারা বঙ্গদেশে স্থানে স্থানে কারবার খুলিয়া বহু অর্থ অর্জ্জন করিতেছে। বাঙালীও তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বাণিজ্যে লিপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু বাণিজ্যে লিপ্ত শিক্ষিত বাঙালীর সংখ্যা অতি অল্প। নিরক্ষর নিম্নশ্রেণীর লোকেরাই সামান্য দোকান খুলিয়া সামান্য ভাবে কারবার চালাইয়া থাকে। ইহারা ক্ষুদ্র দোকানদার মধ্যে গণ্য। বাঙালী লেখাপড়া শিখিয়া অনিশ্চিত অর্থের আশায় বসিয়া থাকিতে পারে না। চাকরির সুনিশ্চিত অল্পা-য়াস-লব্ধ, অল্প অর্থই তাহার নিকট শ্রেয়ঃ। কারবারের ফল অধ্রুব, লাভক্ষতি উভয়ই হইতে পারে; লোকসান হইলে ত একেবারে সর্ব্বনাশ! লাভ হইলেও কতকাল পরে হইবে, বর্ত্তমানে গ্রাসাচ্ছাদ-নের উপায় কি? বাঙালী, ভাবী উন্নতির পথ বন্ধ করিয়া বর্ত্তমানের দিকেই ঝুঁকিয়া পড়ে। গোষ্পদতুল্য বর্ত্তমান সুবিধাটুকুই ভালবাসে।

প্রাচীনকালে সংসার-বিরাগী নিঃস্বার্থ লোকহিতাকাঙ্ক্ষী ঋষিগণ ভারতসমাজের কর্ণধার ছিলেন। তাঁহাদের দৃষ্টান্ত ও শিক্ষায় প্রাচীন হিন্দুজাতি বর্ত্তমান অপরাপর জাতির ন্যায় ইহকালসর্ব্বস্ব ছিলেন না।

সুতরাং অর্থের প্রতি আর্য্যগণের একান্ত অনুরাগ ছিল না। বর্ত্তমান বাঙ্গালী হিন্দুও উত্তরাধিকারীসূত্রে ইহার অধিকারী নয়, একথা বলা যায় না। হিন্দুর এই জাতীয় স্বভাব এখনও একেবারে তিরোহিত হয় নাই। অর্থবৃদ্ধি-বিষয়ে নিশ্চেষ্টতার ইহাও একটী কারণ। সৎসাহস ও অধ্যবসায়ের কার্য্যে বাঙালী স্বভাবতঃ পরাঙ্মুখ। এই জন্যই নানা দেশে যাইয়া বাণিজ্যবিস্তারের ইচ্ছা ও চেষ্টা তাহার পক্ষে বলবতী হয় না।

বাণিজ্য ব্যবসায়ে শিক্ষার যথেষ্ট অভাব ও অনভিজ্ঞতা আছে বলিয়া এই বিষয়ে অনেকেই নিরুদ্যম। হাতে কলমে উপযুক্ত শিক্ষা না পাইয়া কারবার আরম্ভ করিলে অকৃতকার্য্য হওয়ার সম্ভাবনা অধিক। অতএব এ বিষয়ে যাহাতে লোকে সহজে শিক্ষা পাইতে পারে, দেশমধ্যে তাহার সুবন্দোবস্ত থাকা অত্যাবশ্যক। মূলধনের অভাব বা অল্পতাবশতঃ অনেক উৎসাহী যুবক কারবারে হস্তক্ষেপ করিতে অসমর্থ হইয়া ভগ্নমনোরথ হইয়া থাকেন। "উত্থায় হৃদি লীয়ন্তে দরিদ্রানাং মনোরথাঃ।" দরিদ্রের মনোরথ হৃদয়ে উদিত হইয়া হৃদয়েই লয় পায়। এই জন্যই যৌথ কারবার প্রশস্ত। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থ, তজ্জন্য অনৈক্য এবং অসততা যৌথ কারবারের মূলে কুঠারাঘাত করে। আবার জনসাধারণ ইহার প্রতি আস্থাবান না হইলে এ বিষয়ে উন্নতি অসম্ভব।

লক্ষ্মী চঞ্চলা বলিয়া আমরা অপবাদ দিয়া থাকি, কিন্তু বাস্তবিক লক্ষ্মী যে আমাদের দোষেই চঞ্চলা। ধন ও ঐশ্বর্য্যলাভ হইলেই চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠে। চিত্তে বিকার জন্মে। ধনের অসদ্ব্যবহার হইতেই পাপ প্রবেশ করে, কাজেই লক্ষ্মীর আসন সেখানে অচল থাকিতে

পারে না। লক্ষ্মী পাপীর নহে, পুণ্যাত্মার। তাই অতি সাবধানে লক্ষ্মীর সেবা করিতে হয়, নচেৎ দেবী কুপিতা হইয়া অচিরে তিরোধান করেন।

"অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যম্।"

অর্থ অনর্থ এই কথা নিরর্থক নহে। অর্থে বাস্তবিকই অনর্থ ঘটায়, যদি অর্থবানের আত্মসংযম না থাকে। কত ধনী যুবক বিলাসিতা ও পাপে ডুবিয়া আত্মনাশ ও সর্ব্বনাশ করিয়াছে, করিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। উর্দ্দূতে একটী কথা আছে,—"বহুৎসী চীজে জাহির মে খুব্ মালুম হোতী হ্যায়, লেকেন্ হাসিল উন্‌কা থোড়া হ্যায়।" এমন অনেক জিনিষ আছে, যাহা বাহিরে দেখিতে বেশ সুন্দর, কিন্তু কাজে কিছুই নয়। যথা, মাকালফল। বিলাসিতা অনেক যুবাকে মাকালফল করিয়া তোলে। অর্থ চরিত্রস্খলন করিবার ক্ষমতা যথেষ্ট রাখে। অর্থের সদ্ভাব ও অভাব উভয়েই লোককে পাপের পথে লইয়া যাইতে পারে। অতএব এই উভয় অবস্থাতেই বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক।

লক্ষ্মীর বাহন পেঁচা। পেঁচার উপর ভর করিয়া লক্ষ্মী চলিতে থাকেন। যাহাদের স্কন্ধে লক্ষ্মীপেঁচা ভর করে, তাহারা পেচক-স্বভাব। পেচক দিবাভীত, নিরানন্দ, কাকাদির ভয়ে দিনে দেঁয়ালের ফাটালে, আঁধারে লুকাইয়া থাকে। কৃপণ ধনী দীন দুঃখীর ভয়ে একান্ত ভীত হইয়া স্বীয় জীর্ণভবনের এক কোণে অবস্থান করে। পেচক নিশাচর, রাত্রিতে আহার-অন্বেষণ করে। কৃপণ চোরের ভয়ে রাত্রি জাগিয়া থাকে, এবং মনে মনে সিন্ধুকস্থ অর্থের চিন্তাও ভোগ করে। পেঁচা একক, অন্য পক্ষীর সহিত তাহার কোন সংশ্রব নাই। কৃপণ

সমাজের কোন শুভকার্য্যে যোগদান করে না; সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন, একাকী। কৃপণ বাস্তবিকই সর্ব্বতোভাবে পেচকের প্রকৃতি পাইয়া থাকে, সুতরাং কৃপাপাত্র। সে বোঝে না যে, ধনের অধিকার তাহার নাই। সে কেবল অবৈতনিক প্রহরী। বাস্তবিক কৃপণের ধন নিজের ভোগেও আসে না, দেবভোগেও লাগে না।

কৃপণ কৃপার পাত্র হইলেও তাহার নিকট আমরা সুন্দর একটী উপদেশ পাই। অর্থই কৃপণের পরমার্থ, উপাস্য দেবতা। পৃথিবীর সকল বস্তু অপেক্ষা অর্থ তাহার প্রিয়; যশঃ মান, এমন কি, প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়। অর্থের জন্য সে সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত। কৃপণ আমাদিগকে একনিষ্ঠা শিক্ষা দিয়া থাকে।

ধনী হইলেও ধনবৃদ্ধির চেষ্টা কর্ত্তব্য। যাহারা পৈতৃক ধনে ধনবান্, প্রভূত পৈতৃক ধনের অধিকারী, তাহাদেরও নিশ্চেষ্ট না থাকিয়া শ্রমস্বীকারপূর্ব্বক অর্থার্জ্জনে অভিনিবিষ্ট হওয়া উচিত।

ন্যায়পূর্ব্বক স্বোপার্জ্জিত অর্থের প্রতি একটা মমতা জন্মে, সাধারণতঃ পরার্জ্জিত অর্থের প্রতি সেরূপ হয় না। এই মমতাই অনেক সময় অসৎ অনাবশ্যক ব্যয়ে বাধা দেয়, এবং অর্থের সদ্ব্যয়ে বিমল আনন্দ জন্মে। অনায়াসলব্ধ বস্তু মূল্যবান্ হইলেও সম্যক্ আদর পায় না। আয়াসলব্ধ বস্তু স্বল্পমূল্য হইলেও সমধিক আদৃত হইয়া থাকে। পিতা পিতামহ আপনার হইলেও আত্ম-তুলনায় পর। নিজের প্রতি, নিজস্বের প্রতি যেরূপ আকর্ষণ, পরস্বের প্রতি সেরূপ হয় না।

ধনের অর্জ্জনে কর্ম্মতৎপরতা, সততা ও অধ্যবসায়, সঞ্চয়ে মিতাচার, ব্যয়ে সদ্বিবেচনার প্রয়োজন। অর্জ্জন অপেক্ষা ব্যয় ও সঞ্চয়

করা কঠিন কর্ম্ম। বহুআয়বান্ ব্যক্তিও যদি সঞ্চয় করিতে না পারেন, তবে তিনি দরিদ্র। নানা দিকে নানা অভাব, প্রকৃত অভাব মোচন করিয়া কিছু কিছু সঞ্চয় করিতে ধৈর্য্য ও হিসাবের দরকার। আবার কোন্ ব্যয় সঙ্গত, কোন্টা অসঙ্গত, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে সুবুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন।

"আয়ে দুঃখম্"। বিনা দুঃখে, বিনা শ্রমে অর্থ-উপার্জ্জন হয় না। আবার, সঞ্চয় করাও অনেকের পক্ষে কষ্টকর। কিন্তু একবার কিছু টাকা হাতে করিতে পারিলেই সঞ্চয় করা শেষে আর তত কঠিন হয় না। এক টাকাও যদি সঞ্চয় করা যায়, সেই একটাকাই কালে একশত টাকা হইবে, সেই একটাকাই এক মোহর হইবে। বস্তুতঃ প্রথম সঞ্চিত মুদ্রা পরশমণিতুল্য। ভক্তিশাস্ত্রে ভবিষ্যতের ভাবনা ও সঞ্চয় করা নিষিদ্ধ হইলেও বিষয়ীর পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। দুঃখের দিনে টাকার মত বন্ধু আর কে হইবে? দুঃখের দিনে হাসিমুখে কে আর অত কাজ করিবে?

সঞ্চয়শীল হইতে হইবে, কিন্তু অতিসঞ্চয় কর্ত্তব্য নহে। ধনের প্রতি অতিমাত্র প্রীতি থাকা সঙ্গত নহে। ইহাতে লোক ব্যয়কুণ্ঠ হয়। কৃপণের "ব্যয়ে দুঃখম্"। ব্যয় করিতে হইলেই প্রাণে বড় লাগে। কিন্তু সৎ ও উচিত ব্যয়ে মুক্তহস্ত হইতে না পারিলে অর্জ্জনের কোন সার্থকতা থাকে না। অব্যয় অপেক্ষা সব্যয় হওয়া বাঞ্ছনীয়, কিন্তু অমিত ব্যয় আদরণীয় নহে। অনেক সময় মিতব্যয়ীকে কৃপণ আখ্যা দেওয়া হয়। এই দুর্ণাম পরিহার করিবার জন্য কেহ কেহ অমিতব্যয়ী হইয়া থাকেন এবং পরিণামে দুঃখ ভোগ করেন। ব্যয়ের মাত্রা অতিক্রম করিয়া "যত্র আয় তত্র ব্যয়"

করিলে, অথবা আয়ের অধিক ব্যয়শীল হইলে, পরিণামে দুঃখভোগী হইতে হয়।

ধনের প্রথম প্রয়োজন,—আত্মরক্ষা ও আত্মোন্নতি। দ্বিতীয় প্রয়োজন,—পররক্ষা ও পরোন্নতি। আমরা অর্থ উপার্জ্জন করিব নিজের অভাব দূর করিতে, অভাবের মধ্যে পড়িয়া থাকিবার জন্য নয়। অর্থ উপার্জ্জন করিব নিজের বলবৃদ্ধি করিতে, বলক্ষয় করিবার জন্য নয়। উপার্জ্জন করিব পরের দুঃখ দূর করিতে, পরকে দুঃখ দিবার জন্য নয়।

ভোগার্থীরা মনে করেন, ধনের প্রয়োজন ভোগ। কিন্তু লোকে একাকী অদ্বিতীয় থাকিয়া ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। ভোগের জন্য জন চাই। ধন থাকিলে কি হইবে? জন না থাকিলে কারে লইয়া ভোগ? স্ত্রী পুত্রাদি কেহই নাই, এমন ধনীর কি সুখ? সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী, এমন একজনও যার নাই, ধনরাশি তাহাকে কি সুখ দিতে পারে? কর্ত্তব্যপরায়ণ গৃহস্থ স্বোপার্জ্জিত অর্থে স্ত্রীপুত্রাদি পরিবারবর্গের অভাবমোচন ও ভরণপোষণ করিয়া আনন্দ অনুভব করেন। প্রত্যেক পরিজনের কল্যাণ বিধান, উন্নতি ও সুখসাধন প্রভৃতি কর্ত্তব্য পালন করিয়া উদারবুদ্ধি গৃহী কত সুখী হইয়া থাকেন। পরিজন লইয়া ভোগ, পরিজনশূন্য হইয়া ভোগ হয় না।

যিনি যে সমাজের লোক, সেই সমাজ তাহার এক সুবৃহৎ পরিবার। সেই সমাজরূপ বিপুল পরিবারস্থ দুর্গত পরিজনবর্গের অভাব মোচন ও অর্থকষ্ট দূর করিবার প্রশংসনীয় চেষ্টায় ধনবানের ধনের সার্থকতা। এই বৃহৎপরিবারভুক্ত, ক্ষুধিত, নিরন্ন

ব্যক্তির আশু ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণে ও স্থায়ী মঙ্গল সাধনে ধনের সার্থকতা। অর্থের অভাবে কত লোক স্বীয় স্বাভাবিক প্রতিভা বিকাশ করিতে না পারিয়া সাগরগর্ভস্থ রত্নের ন্যায় আঁধারে ডুবিয়া যায়! দারিদ্র্যের প্রবলপীড়নে কত কর্ম্মঠ লোক উচ্চতর কর্ত্তব্যসাধন করিতে না পারিয়া কত মনঃকষ্টে জীবন কাটায়।, কত মানুষ মনুষ্যত্ব হারায়! এ অবস্থায় সমাজের বিশেষ ক্ষতি। সমাজের ক্ষতিতে ধনীরা সকলেই নিজের ক্ষতি বলিয়া মনে করিলে সমাজের দুঃখভার অনেক কমিতে পারে। একজন ধনী অপর দশজনকে ধনী হইবার সহায়তা করিলে নিশ্চয়ই তিনি সমাজের আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইবেন। বিদ্যার অপপ্রয়োগে যেমন নিজের ও পরের অকল্যাণ, সেইরূপ ধনের অপব্যবহারে উভয়েরই অমঙ্গল। অলস দীর্ঘসূত্রী ব্যক্তি যেমন সময়ের মূল্য বোঝে না, সেইরূপ অবিবেচক অপরিণামদর্শী ব্যক্তিও অর্থের মূল্য না বুঝিয়া অপব্যয় করিয়া আত্মরক্ষার পরিবর্ত্তে আত্মহত্যা, আত্মোন্নতির পরিবর্ত্তে আত্মাবনতি করিয়া থাকে।

"ধনাৎ ধর্ম্মস্ততঃ সুখম্"। ধনে ধর্ম্ম, ধর্ম্মে সুখ। ধনী ইচ্ছা করিলে ধনপ্রভাবে বহু পুণ্যার্জ্জন করিয়া নিজে সুখী হইতে পারেন, পরকেও সুখী করিতে পারেন। অপরাপর সভ্য জাতির তুলনায় বাঙালী অত্যন্ত জ্ঞান-দরিদ্র ও ধন-দরিদ্র। এ অবস্থায় জ্ঞানীর জ্ঞান বিতরণ, ও ধনীর ধন বিতরণ, অতীব প্রশংসনীয় পুণ্যকর্ম্ম। সম্প্রদায়-বিশেষের হিতকল্পে বা সমগ্র সমাজের উন্নতিকল্পে নিঃস্বার্থভাবে এক-কালীন অর্থদান সামাজিক হিসাবে স্থায়ী ফলপ্রসূ। সর্ব্বদা উদ্‌যুক্ত হইয়া স্বাবলম্বন-বলে অর্থের অর্জ্জন, সঞ্চয়ন, ও বর্দ্ধন করা প্রত্যেক

সুস্থ যুবকের কর্ত্তব্য ; এবং সমাজের কল্যাণে অর্জ্জিত অর্থের একাংশ ব্যয় করিতে প্রত্যেক অর্জ্জনকারী ব্যক্তিই ধর্ম্মতঃ বাধ্য।

"উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ ॥"

অলস বাঙালী দৈবের দোহাই দিয়া নিষ্কর্ম্মা হইয়া ঘরে বসিয়া থাকে। যাহারা কাপুরুষ, তাহারা যথার্থই অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া নিজ নিজ অযোগ্যতা প্রদর্শন করে। কিন্তু এই প্রবল প্রতিযোগিতার যুগে অযোগ্যের স্থান কোথায় ? না মর্ত্ত্যে, না স্বর্গে। ঘরে বসিয়া-শুইয়া 'লক্ষ্মী' 'লক্ষ্মী' উচ্চারণ করিলেই অলস কাপুরুষের কাছে লক্ষ্মী আসিবেন না। লক্ষ্মী তাঁহাদের নিকট স্বয়ং আগমন করিয়া থাকেন, যাঁহারা উদ্যমশীল পুরুষসিংহ। লক্ষ্মীর বরপুত্র তাঁহারা, যাঁহারা পরিশ্রমী পুরুষসিংহ। লক্ষ্মীকে প্রসন্ন করিতে হইলে পুরুষ হইতে হইবে। কাপুরুষ কখনও লক্ষ্মীর প্রিয়পুত্র হইতে পারে না। "বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ"। বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস। বাণিজ্য দ্বারাই লক্ষ্মীর পূজা করিতে হইবে। সাগর পর্ব্বত লঙ্ঘন করিয়া বাণিজ্যার্থ দূরবিদেশে যাতায়াত করিতে হইবে। দৈবহত্যা করিয়া আত্মশক্তিবলে পুরুষত্ব দেখাইতে হইবে, তবে লক্ষ্মী প্রসন্ন হইবেন।

ধন বাহিরের আগন্তুকশক্তি। আভ্যন্তরীণ আত্মশক্তির সাহায্যে এই আগন্তুকশক্তিকে আহ্বান করিয়া আনিতে হইবে। "ধনবান্ বলবান্ সর্ব্বঃ।" ধন আছে যার, বল আছে তার। ধন হইলেই বলবৃদ্ধি হয়। বিশেষ চেষ্টাসত্ত্বেও বিদ্যার্থিমাত্রই বিদ্বান্ হইতে পারে

না, সেইরূপ সকল লোকেই ধনী হইবে, এরূপ আশা করা যায় না; কিন্তু যত্ন করিলে সকল সমাজই ধনাঢ্য হইতে পারে। সমাজের ধনবল একান্ত আবশ্যক। ধনবল বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠিত। আশুপ্রয়োজনসিদ্ধির নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ অর্থলাভে সন্তুস্ট থাকিলে লক্ষ্মী সন্তুষ্ট হইবেন না।

পুরাকালে দেবতারা অসুরের সাহায্য লইয়া, মন্দার পর্ব্বতকে মন্থনদণ্ড করিয়া সমুদ্রমন্থনপূর্ব্বক লক্ষ্মীকে লাভ করিয়াছিলেন। সমুদ্র রত্নের আকর, লক্ষ্মীর প্রিয় নিকেতন। দেহটাকে অসুরের বলে বলীয়ান্ করিয়া, পর্ব্বত-বাধা উন্মূলিত করিয়া, সকলে মিলিয়া-মিশিয়া বাণিজ্যার্থ সমুদ্র মন্থন করিতে পারিলে বহু ধন রত্ন মিলিবে, লক্ষ্মীলাভ হইবে।

কলাবিদ্যা।

"সাহিত্য-সঙ্গীত-কলা-বিহীনঃ
সাক্ষাৎপশুঃ পুচ্ছ-বিষাণ-হীনঃ।" নীতিশতক।

কেবলই কি টাকা টাকা করিয়া কাকের ন্যায় কঠোর কণ্ঠে কা কা করিতে হইবে? অর্থের জন্য উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন করিয়া কেবলই কি গলদ্‌ঘর্ম্ম শ্রম করিতে হইবে? ঘর্ম্ম অপনয়ন করিবার জন্য কি দু'দণ্ড বিশ্রাম করিতে হইবে না? এ প্রশ্নের উত্তরে প্রকৃতি দেবী বলিবেন—বিশ্রাম অবশ্যই চাই।

প্রখর নৈদাঘ রবিতাপের পর, সান্ধ্য শীতলবায়ু ও নৈশস্নিগ্ধ চন্দ্রালোক। বর্ষার মেঘমলিন বজ্র-করাল আকাশ হইতে বিগলিত অবিরল জলধারার পর, শরতের শুভ্র হাসিরাশি। তীব্র শীতের তুহিনসম্পাতের পর, ফুল্ল-কুসুম-সৌরভ-বাহী মলয়ানিল। প্রকৃতির এইরূপ পরিবর্ত্তন জীবের অশেষ কল্যাণপ্রদ, স্বাস্থ্যকর ও আনন্দবর্দ্ধক। কায়িক শ্রমের পর মানসিক শ্রম, মানসিক শ্রমের পর কায়িক শ্রম, স্বেদাপ্লুত কর্ম্ম-কোলাহলময় শ্রান্ত দিবাজাগরণের পর শান্তিময় সুষুপ্তি, এবং সুষুপ্তির পর কর্ম্মময় জাগরণ, দেহ ও মনের রসায়ন-বিশেষ।

মন যখন শ্রম করিয়া করিয়া ক্লান্ত হইয়া পড়ে, তখন শরীরকে একটা কাজ দিলে মনের বিশ্রাম হয়। আবার শরীরটা যখন খাটিয়া

খাটিয়া অবসন্ন হয়, তখন সে বসিয়া থাকিতে চায়, কিন্তু মন নিষ্কর্ম্মা হইয়া থাকিতে পারে না। মন বড় চঞ্চল। তুমি কোন কার্য্যে লিপ্ত থাক আর নাই থাক, মন কখনও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। মনের কার্য্য চিন্তা প্রায় সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। কায়িকশ্রমকালে উহা বড় একটা বুঝা না গেলেও, বিশ্রামার্থ একাকী, শ্রমশূন্য, অলস হইয়া বসিয়া থাকিলে, বেশ বুঝা যায়। সুতরাং বিশ্রামকালে মনকে একটা বিষয় দেওয়া চাই। এমন একটা বিষয় দেওয়া দরকার, যাহাতে তার বিমল আনন্দ জন্মে, যাহাতে সে অজ্ঞাতসারে সানন্দে উন্নতি ও মঙ্গলের দিকে অগ্রসর হইতে পারে।

নিদ্রাকাল ব্যতীত কখনও বিশ্রাম কর্ম্মহীন বিশ্রাম হওয়া উচিত নয়। কর্ম্মহীনতা বা আলস্যের নাম বিশ্রাম নহে। বৃথা কালহরণকে বিশ্রাম বলা যায় না। এক প্রকার কঠিন পরিশ্রম হইতে অন্যপ্রকার আমোদজনক লঘুশ্রমের নাম বিশ্রাম। সংসার-চিন্তা-ভারাক্রান্ত, দিবসের অসার বা অযথা শ্রম-ক্লান্ত, বিভ্রান্ত বাঙালীর বিশ্রাম কোথায়? বাঙালী এক দিকে অলস-প্রকৃতি, অন্য দিকে স্বল্প লাভের তরে গুরু-বিরস, বুদ্ধির প্রখরতানাশক, অগ্নিমান্দ্যকারক, জাড্যজনক, একরূপ শ্রমে অভ্যস্ত; সুতরাং বিশ্রামসুখে বঞ্চিত। বাস্তবিক অবসরকাল কাটাইবার কৌশল আমাদের একপ্রকার অবিদিত। বৃথা গল্পে, পরনিন্দায়, তাসপাশাখেলায়, আমাদের অনেকের অবসরকাল কাটিয়া যায়। ইহাতে যে সুখ তাহা দুঃখের নামান্তর; অপর উন্নত সমাজের বিশ্রামসুখের তুলনায় অতি নিকৃষ্ট। সঙ্গীতাদি কোন একটী বিশুদ্ধ আমোদজনক সরস বিষয় লইয়া ধীমান্ সুরসিক ব্যক্তি বিশ্রামকাল কর্ত্তন করেন।

সঙ্গীত।

"গানাৎ পরতরং নহি।" সঙ্গীত অপেক্ষা চিত্তদ্রবকারী উৎকৃষ্ট-তর বিষয় আর কিছুই নাই। বিশ্রাম ভোগের পক্ষে সঙ্গীত অত্যন্ত উপযোগী। সঙ্গীতের মোহিনী শক্তি অনির্ব্বচনীয়। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া-ছেন, "বেদানাং সামবেদোঽস্মি"। আমি বেদসকলের মধ্যে সামবেদ। এ কথার বোধ হয় ইহাই তাৎপর্য্য যে, সাম গীত হইয়া থাকে, ইহাতে লোকের মন ভগবানের প্রতি যেরূপ আকৃষ্ট হয়, অন্য আর কোন মন্ত্রাদিতে সেরূপ হয় না। কৃষ্ণের মুরলীরবে গোকুল পুলকিত হইত, ওরফিয়স (Orpheus)এর গানে পশুপক্ষী পর্য্যন্ত মোহিত হইত। তানসেনের সঙ্গীত মোগলকুলতিলক সম্রাট্ আক-বরের সভাকে উৎসবময় করিত। ভক্তকবি রামপ্রসাদের গানে পাষাণহৃদয় গলিয়া যাইত। মধুর সঙ্গীত-রব, শ্রবণ-বিবরে প্রবেশ করিয়া তাড়িত-বেগে হৃদয়যন্ত্র আলোড়িত করিয়া, দেহ-প্রাণ-মন অপূর্ব্ব পুলকে পূর্ণ করিয়া তোলে, দুঃসহ শোকসন্তাপ মুহূর্ত্ত মধ্যে বিদূরিত করে। ধর্ম্মোপদেষ্টা শত সহস্র উপদেশে যে ধর্ম্মভাব মানবহৃদয়ে জাগাইতে সমর্থ নহেন, সঙ্গীত ক্ষণকাল মধ্যে তাহা পারে। দার্শনিক শত ধর্ম্মব্যাখ্যায় যাহা পারেন নাই, মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গের হরিসংকীর্ত্তন তাহা পারিয়াছে। সঙ্গীত মরুময় দেশের ওয়েসিস্ (মরূদ্যান)। ইন্দ্রজালের ন্যায় ইহার ক্রিয়া। ইহাতে কে না মুগ্ধ হয়? মহাদেবের 'নিবাত-নিষ্কম্প-প্রদীপ'বৎ চিত্তও নারদের বীণা-গানে টলিত। শিশু-যুবা, প্রৌঢ়-স্থবির, স্ত্রী-পুরুষ, এমন কি, তির্য্যক্-জাতিও সঙ্গীতে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ক্রূর সর্পও বংশীরবে আত্মহারা

হয়। রণ-সজ্জায় সজ্জিত সৈনিকদিগের হৃদয় রণবাদ্যনিনাদে কি এক মত্ততায় নাচিয়া উঠে। তখন তাহারা প্রাণের মমতা ভুলিয়া যায়।

আবার "যদিও না থাকে সুর তাল জ্ঞান" তথাপি প্রায় সকল মনুষ্যই আপনার ভাবে আপনি মজিয়া সময়ে সময়ে গান ধরে।

সমাজের সৃষ্টি হইতে সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশেই ইহার আদর দেখা যায়। মহাকবি সেক্ষপীর (Shakespeare) বলিয়াছেন, "হৃদয়ে যার সঙ্গীতের ঢেউ খেলে না, সঙ্গীতে যার মন টলে না, গলে না, এমন লোককে বিশ্বাস করা যায় না।"

"The man that hath no music in himself,
Nor is not moved with concord of sweet sounds,
Is fit for treasons, stratagems and spoils.

* * * * *

Let no such man be trusted."

Merchant of Venice.

কোকিলের কলকাকলী সকল পক্ষীর নাই। সকল মানুষই সুগায়ক হইতে পারে না। কিন্তু যত্ন ও শিক্ষার গুণে অনেকেই সঙ্গীত-বিদ্যায় অন্ততঃ কিছু জ্ঞান লাভ করিতে পারে। একঘেয়ে, শুষ্ক, গদ্যময় জীবনকে সরস-প্রফুল্ল, পদ্যময় করিতে হইলে সঙ্গীতের আশ্রয় লইতে হয়; সযত্নে বীণাপাণির চরণসেবা করিতে হয়।

বঙ্গদেশের অনেক অঞ্চলে সঙ্গীতের চর্চ্চা উপযুক্তরূপে হয় না। এই শাস্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্তি অনেকেরই দেখা যায় না। কারণ, সঙ্গীতে জ্ঞান না থাকিলেও অর্থার্জ্জনের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। ইহা সত্য বটে, কিন্তু জীবনের ভার লাঘব করিতে হইলে, বিশ্রামসুখ

উপভোগ করিতে হইলে, সঙ্গীতের প্রয়োজন। সঙ্গীত যে একটা শিক্ষার বিষয় হইতে পারে, ইহা অনেকেরই ধারণা নাই। পিতা-পুত্রে, জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠে, গুরু-শিষ্যে একত্র হইয়া গান করা অনেকের মতে অসঙ্গত, এরূপ করাটা যেন একটা পাপ কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত। অভিভাবকের নিকট সঙ্গীতবিষয়ে বালকগণ কোনরূপ উৎসাহ বা সাহায্য পায় না। কাজেই তাহাদের এই বৃত্তিটী অনমুশীলিত থাকে। রুচি থাকিলেও শিক্ষার অভাবে অনেকেরই এই বৃত্তি বিকাশ প্রাপ্ত হয় না। অনেক স্থলে বলপূর্ব্বক ইহাকে নিরোধ করা হয়। তৌর্য্যত্রিক (নৃত্য, গীত, বাদ্য) ছাত্রদিগের পক্ষে কাহারও কাহারও মতে নিষিদ্ধ হওয়াই উচিত। ইহার স্বপক্ষে যুক্তি এই,—সঙ্গীতে মনকে লঘু করে, বিলাসিতার দিকে টানিয়া লয়, দুর্নীতির আশ্রয় লইতে আহ্বান করে। যাত্রাদলের বালকবৃন্দ, থিয়েটারের যুবকদল, প্রায়ই তরলচিত্ত ও বিলাসপ্রিয়, এবং কেহ কেহ ভ্রষ্টচরিত্র হয়। একথা যথার্থ হইতে পারে, কিন্তু ইহা যে কুশিক্ষা ও কুসঙ্গের বিষময় ফল। ভাল জিনিষও ব্যবহারদোষে মন্দ হইয়া দাঁড়ায়।

জ্ঞান উত্তম জিনিষ, কিন্তু অপপ্রয়োগে অমঙ্গল। ধন জীবনধারণের অতি প্রয়োজনীয় বস্তু, কিন্তু অপব্যবহারে অকল্যাণ। নিদ্রা স্বাস্থ্যের পক্ষে অতি আবশ্যকীয়; কিন্তু অতিনিদ্রা অস্বাস্থ্য আনয়ন করে। তা বলিয়া জ্ঞানলাভ রহিত হইতে পারে না, ধনার্জ্জন অবৈধ হইতে পারে না, নিদ্রা-পরিত্যাগও কর্ত্তব্য হইতে পারে না। প্রেম স্বর্গীয় পবিত্র জিনিষ, কিন্তু কামপর নীচাশয় ব্যক্তির কাছে পড়িয়া তাহাই পঙ্কিল পূতিগন্ধময় কামে পরিণত হয়। তা বলিয়া প্রেম ভাল

নয়, প্রেমিক হওয়া অনুচিত, এ কথা কে বলিবে? সুশিক্ষায়, সৎসঙ্গে, সঙ্গীত সুধাময়। কাম-কলুষিত কুৎসিত সঙ্গীত, সঙ্গীত নামের উপযুক্তই নয়। যে আমোদ পিতা-পুত্রে, গুরু-শিষ্যে মিলিয়া উপভোগের অযোগ্য, তাহাতে আবিলতা আছেই বুঝিতে হইবে। যেমন আকাশ হইতে পতিত মেঘ-বারিধারা অতি বিশুদ্ধ, নির্ম্মল, সুপেয়; কিন্তু নালা ডোবায় পড়িয়া অশুদ্ধ, সমল ও অপেয় হয়। সেইরূপ সঙ্গীত স্বরূপতঃ বিশুদ্ধ, পাত্রভেদে অশুদ্ধ। উন্নত সঙ্গীতে মন উন্নত, কুসঙ্গীতে কলুষিত হয়। অথবা কুৎসিত মনে কুসঙ্গীতের জন্ম; এবং কুরুচিপূর্ণ সমাজে কুসঙ্গীতই প্রশ্রয় পাইয়া থাকে। উন্নত সঙ্গীত উন্নত সমাজেরই পরিচায়ক।

সঙ্গীত জিনিষটা প্রকৃতপক্ষে যদি মন্দই হয়, তবে ইহাকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া সমাজ হইতে একেবারে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়াই উচিত। যদি ভাল হয়, তবে প্রত্যেকেরই আলিঙ্গন করা অসঙ্গত নহে।

ভাই ভগ্নী পরস্পর প্রীতির বন্ধনে সম্বদ্ধ থাকিয়া প্রতিদিন কর্ত্তার সঙ্গে অন্ততঃ একবার প্রাতে কি সন্ধ্যায় মিলিত কণ্ঠে বিভুগুণগান করিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করা কি অন্যায়, অধর্ম্ম? যে সমাজে প্রায় প্রত্যেক পরিবার এই প্রকার বিশুদ্ধ সঙ্গীতানন্দ আস্বাদ করিয়া থাকে, সেই সমাজে দেবগণ স্বর্গ হইতে পুষ্পবৃষ্টি করিয়া থাকেন।

বৈদেশিক বাদ্যে ও নকল গানে আমরা আমোদ পাইতেছি বটে, কিন্তু সমাজ হইতে দিন দিন আমোদ-আহ্লাদ চলিয়া যাইতেছে। আনন্দ-উৎসব কমিতেছে। শিক্ষিতগণ কোন কোন উৎসবকে বর্ব্বরোচিত মনে করিয়া বিদায় দিতেছেন।

প্রফুল্লতা চিত্তের নীরব সঙ্গীত, মনের স্বতঃ আনন্দপ্রবাহ নির্ঝরের

ঝর্‌ঝর্‌ কল্‌কল্‌ শব্দের ন্যায়, গীতে বাদ্যে অভিব্যক্ত হইয়া থাকে। সঙ্গীতের অভাব, অনাদর, আনন্দের অভাব সূচনা করে। আনন্দের অভাবে সঙ্গীতের অনাদর, অবশেষে মৃত্যু।

কাব্য।

"কাব্যশাস্ত্রবিনোদেন কালো গচ্ছতি ধীমতাম্।
ব্যসনেন চ মূর্খাণাং নিদ্রয়া কলহেন চ॥"

বিদ্বান্, ধীমান্, ব্যক্তিগণ কাব্যপাঠজনিত সুখে কালকর্ত্তন করিয়া থাকেন; আর মূর্খেরা তাস পাশা খেলিয়া, ঘুমাইয়া ও কলহ করিয়া কাল কাটায়।

কাব্য কি? 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'। রসই কাব্যের প্রাণ। রস কি? রস অনির্ব্বচনীয় আনন্দবিশেষ। ইহা আস্বাদনের বস্তু, বুঝাইবার বস্তু নহে। ব্যাখ্যা করিয়া মধুর মিষ্টত্ব বুঝান যায় না, আস্বাদনেই বুঝিতে হয়। কাব্যরসও সেইরূপ উপভোগক্ষম, ব্যাখ্যার্হ নহে। ইহা 'ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদরঃ'। ব্রহ্মাস্বাদতুল্য। ব্রহ্মানন্দ কেমন, কে বলিবে? কে বুঝাইবে? ব্রহ্মানন্দের ন্যায় কাব্যরসও নিরুপম, অনির্ব্বচনীয়। কাব্যপাঠে মন কি এক অপূর্ব্ব, অপার্থিবভাবে পরিপূর্ণ হইতে থাকে, তাহা বাক্যে প্রকাশ করা যায় না। 'কাব্যং জগন্মঙ্গলম্', কাব্য জগতের মঙ্গল। কাব্যে যেরূপ জগতের মঙ্গল হইয়া থাকে, এরূপ আর কিছুতেই নহে। রামায়ণ, মহাভারত যেমন ভারতসমাজের উপকার করিয়াছে, কপিল-কণাদের দর্শন-বিজ্ঞান কি তেমন পারিয়াছে? এই দুই মহাকাব্য সমগ্র সমাজকে সঞ্জীবিত ও উন্নমিত করিয়াছিল। ইহারা জ্ঞান ও সুখের অনন্ত উৎস, অক্ষয়

অমৃতভাণ্ডার। কত কবি কাব্যদ্বয় হইতে জ্ঞানামৃত পান করিয়া অমর হইয়াছেন, কত ধর্ম্মপিপাসু ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়াছেন। সংস্কৃত কবিদের ত কথাই নাই, বর্ত্তমানকালে পাশ্চাত্যবিদ্যায় কৃতবিদ্য গ্রন্থকারগণও এই কাব্য দুইখানির নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী। ফলতঃ কাব্যই সমাজের জীবনকে সরস, কাব্যময় করিয়া রাখে, জাতীয় জীবনকে সজীবতা প্রদান করিয়া থাকে। কাব্যশূন্য সমাজ ও ব্যক্তি শীতকালের ফল-পুষ্প-পল্লব-রহিত জীর্ণতরুর ন্যায় শোভা-সৌন্দর্য্যহীন, মৃতকল্প।

Dead is the life without poetry,
Deedless, and with no heart to feel,
Like to a tree shorn of beauty—
Flower, fruit and leaf,—in winter chill.

সভ্যতার উন্নতিতে কাব্যের অবনতি, একথা প্রসিদ্ধ ইংরেজ সমালোচক বলিয়াছেন। সরস বাল্যে ও উদ্দাম যৌবনে যখন সংসারটা রসে ভরপূর বলিয়া বোধ থাকে, তখন হৃদয়-কাননে কবিতাকুসুম ফুটিয়া উঠে। আর, বিরস বার্দ্ধক্যে যখন নিরাশার উষ্ণতাপে হৃদয় মন দগ্ধ হইতে থাকে, তখন কবিতাকুসুমও ম্লান হইয়া যায়। সেইরূপ সমাজের বাল্যে ও প্রথম যৌবনাবস্থায় কবিতার সৃষ্টি ও বিকাশ, প্রৌঢ়াবস্থায় সভ্যতার বৃদ্ধিতে কবিত্ব ম্লান হইতে দেখা যায়। সভ্যতার তীব্রপ্রখরতাপে কবিতার কোমল প্রাণ আইঢাই করে।

একথা সত্য যে, আদিম ঋজু সমাজে আদৌ জীবনসংগ্রাম ছিল না, তখন লোকে কাব্যামোদ উপভোগ করিবার যথেষ্ট সুযোগ ও অবসর পাইত। কিন্তু বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞান-বিজ্ঞান-সমৃদ্ধ, জটিলতা-বহুল সভ্য-

সমাজে লোক জীবনযুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিয়া আর সেরূপ কাব্যের অনুশীলন ও রসাস্বাদ করিতে সমর্থ হয় না। আবার, ইউরোপীয় সভ্যতার উন্নতির যুগেই সেক্ষপীর, মিল্টন, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, টেনিসন্, কাব্যরাজ্যের রাজা। ভারতবর্ষেও সভ্যতার উৎকর্ষকালেই বাল্মীকি, বেদব্যাস, ভবভূতি, কালিদাস, কাব্যজগতে রাজাধিরাজচক্রবর্ত্তী। ইংলণ্ডীয় সভ্যতার ছায়ায় মধু, হেম, নবীন, রবীন্দ্র উজ্জ্বল কবিরত্ন। তবেই সভ্যতায় কবিতার উন্নতি কি অবনতি, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ হওয়ারই সম্ভাবনা। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, ক্রমশঃই কাব্যপিপাসুর সংখ্যা-হ্রাস হইতেছে।

কাব্যে যদি কেবল রসই পাওয়া যায়, তবে কাব্যরসিকের সংখ্যা-হ্রাস কেন? সকলেই ত রস চায়। এক কারণ, অবকাশের অভাব, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আর একটী কারণ, কাব্য ছাড়িয়াও অন্যান্য বহুতর বিষয়ে লোকে আজকাল রস পাইতে চেষ্টা করে। "রসো বৈ সঃ"। ব্রহ্ম রসস্বরূপ, তথাপি ব্রহ্মরস ছাড়িয়া লোকে বিষয়রসে ডুবিয়া থাকিতে লালায়িত কেন? আবার, কাব্যরস পান করিতে ইচ্ছা করিলেই পান করা যায় না; হৃদয় চাই, হৃদয়ের শিক্ষা চাই। ইচ্ছা করিলেই ব্রহ্মানন্দ সম্ভোগ হয় না; সাধনা চাই, তপস্যা চাই।

কবির হৃদয় চিরকালই প্রশস্ত, শুষ্কতার বিরোধী, চাতকপক্ষীর ন্যায় উর্দ্ধগগনবিহারী। বিষয়াসক্ত সাধারণ লোকের সঙ্কীর্ণহৃদয় কবিহৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে না, এই উভয় হৃদয়ের মিল-মিশ হয় না। কবির কল্পনা কর্ম্মব্যস্ত বিষয়ীর ভাল লাগে না। আবার, বর্ত্তমান বঙ্গকবিদিগের অনেকেই পূর্ব্বকালীন বহুমূল্য ঢাকাই জামদানী

সূক্ষ্মবস্ত্রের ন্যায়, ভাবসূক্ষ্ম কবিতা লিখিয়া থাকেন। তাহা "মূর্খে বুঝিবে কি, পণ্ডিতের লাগে ধাঁধা।" ঢাকাই সূক্ষ্ম কাপড় সর্ব্বসাধারণের ভোগে না আসিয়া, ধনীবিলাসীদিগেরই ভোগে আসিত। বর্ত্তমান অধিকাংশ কবিতাও জনসাধারণের অযোগ্য, অভোগ্য।

এই জড়-প্রিয়তার যুগে, কঠোর বাস্তবতার দিনে, লোকের কেবল করস্পর্শক্ষম স্থূলবস্তু লইয়াই ব্যস্ততা, ভাবরাজ্যে বিচরণ করিবার প্রবৃত্তি নাই, রুচি নাই। আবশ্যকতা-বোধও নাই। কিন্তু আবশ্যকতা যথেষ্ট আছে। উপর্য্যুপরি অনেক দিন মুসূরী বা কলাই দাল খাইতে খাইতে মুখে অবশ্যই অরুচি জন্মে, স্বাস্থ্যেরও বিঘ্ন জন্মায়। তাই অন্যবিধ দাল, তরকারীর ব্যবস্থা করা আবশ্যক। সেইরূপ প্রতিদিন না পারিলেও মধ্যে মধ্যে যথাকালে কাব্যসাহিত্যের চর্চ্চা করিয়া মনের রুচিটাকে একটু একটু বদলাইয়া লইতে হয়। ইহাতে মনের রুক্ষতা দূর হইয়া স্নিগ্ধতা জন্মে। প্রতিনিয়ত বস্তুজগতের বস্তুরস পান করিয়া সংসারটা রসহীন বলিয়া বোধ হইলে, মাঝে মাঝে উচ্চ গ্রামের ভাবরাজ্যে মনকে লইয়া গেলে, মনে একটা নূতন বল, নূতন তেজ ও স্ফূর্ত্তি আসে। বস্তুরস নবীভূত হইয়া মধুরতর হয়। যেমন কঠোর শারীরিক শ্রমে শরীর অবসন্ন হইলে, আহার ও নিদ্রার পর শরীরে একটা নূতন বল আসে, এবং পুনরায় শ্রমসামর্থ্য জন্মে, সেইরূপ কাব্যসাহিত্যের অনুশীলনে মনে সজীবতা ও সরসতা আসে। কাব্যসাহিত্যের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার সমধিক প্রচলনে সমাজের সঙ্কীর্ণতা ঘুচিয়া, উদারতার উদয় ও ব্যক্তিগত নির্ম্মল সুখের মাত্রা বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

সৌন্দর্য্য-বোধ।

কাব্য-সাহিত্য-সঙ্গীতের শ্রীবৃদ্ধি ও উপাদেয়তা সৌন্দর্য্যবোধের উৎকর্ষের উপর অনেকটা নির্ভর করে। একটা স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য-জ্ঞান সকল মানুষের চিত্তেই আছে। কোথাও অল্প, কোথাও বা অধিক, কোথাও প্রবুদ্ধ, কোথাও বা প্রসুপ্ত। নির্ম্মলচিত্ত, সরল অবোধ মানবশিশু প্রায় যাবতীয় পদার্থেই সৌন্দর্য্য দেখে, অতি সামান্য তুচ্ছ বস্তুও তাহার নিকট কেমন সুন্দর! উহা দেখিয়া ধরিয়া তাহার কতই আনন্দ! সংসারের কোন বস্তুই বুঝি তাহার নিকট কুৎসিত বলিয়া বোধ হয় না। সে বিষধর সর্পকেও সুন্দরবোধে আলিঙ্গন করিতে চায়। জগতের প্রতিপদার্থ, যাহাই তাহার নেত্র-গোচর হয়, তাহাই সুন্দর। কিন্তু জ্ঞান ও বয়োবৃদ্ধিসহকারে এই বিচাররহিত সৌন্দর্য্যবোধ ক্রমে ক্রমে সঙ্কুচিত হইতে থাকে। অবশেষে অনেক স্থলেই স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য কৃত্রিমতায় পরিণত হয়। স্বার্থের সংঘর্ষে, শিক্ষার অভাবে বা কুশিক্ষার প্রভাবে সুন্দর কুৎসিত হয়, কুৎসিত সুন্দর হয়।

সুন্দর কি? শক্তিই সুন্দর। শক্তির বিকাশই সৌন্দর্য্য। বীজ অঙ্কুরিত হইয়া যখন পত্র-পুষ্প-ফলে শোভমান বৃক্ষে পরিণত হয়, তখন উহা সুন্দর। যৌবনে দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির বল বৃদ্ধি হইতে থাকে, যৌবন সুন্দর। যখন রোগ বা জরা আসিয়া মানুষের বলহরণ করে, তখন সে কুরূপ। মনুষ্যত্বের বিকাশই মানুষকে সুন্দর করে। লোকের শক্তি-প্রয়োগ কুৎসিত হইতে পারে, কিন্তু তা বলিয়া শক্তি কুৎসিত নহে। কারণ, বীজ-শক্তিতে সৌন্দর্য্যের বীজ নিহিত থাকে।

গ্রীক্ দার্শনিক পণ্ডিত মহাত্মা সক্রেটিস্ বলিয়াছেন,—যাহা কার্য্য-

কর, কাজে আসে (useful), তাহাই সুন্দর। কিন্তু একথায় বোধ হয় সকলের মন উঠিবে না। লৌহ খুব কাজের জিনিষ, ধাতুজ পদার্থের মধ্যে ইহার মত নিত্য-ব্যবহার্য্য পদার্থ দ্বিতীয় নাই। কিন্তু ইহাকে সুন্দর বলিবে কে? জীর্ণ তৃণঘাসে ঘরের ছাউনি হয়, কয়জন ইহাকে সুন্দর বলে? জ্বালানি কাষ্ঠ অতি প্রয়োজনীয়, কিন্তু কে ইহা সুন্দর দেখে? তবে সুন্দরের এইরূপ সংজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারে;—যাহা চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের আহ্লাদ জন্মাইয়া, চিত্তের অপূর্ব্ব বিকাশ ও আনন্দ উৎপাদন করে, যাহা উপকারক, তাহা সুন্দর। বালসূর্য্য, পূর্ণচন্দ্র সুন্দর। ইহারা চক্ষুর প্রীতি সাধন করিয়া চিত্তকে প্রফুল্ল করে। ইহারা জগতের উপকারক। গ্রীষ্মাবসানে মেঘগর্জ্জন কর্ণের প্রীতি জন্মাইয়া মনের আনন্দ বিধান করে, উপকারার্থ উদিত মেঘের বারি-বর্ষণ সূচনা করে। ইহা সুন্দর।

বাহিরের রূপ, যাহা চোখে দেখিতে ভাল, তাহাই সুন্দর, অজ্ঞ লোকের এইরূপ ধারণা। কিন্তু জ্ঞানের ন্যায় সৌন্দর্য্যও পাঁচ ইন্দ্রিয় ভেদে পাঁচ প্রকার। যথা, চাক্ষুষ, শ্রাবণ, রাসন, ঘ্রাণ ও ত্বাচ। তবে চক্ষু পাঁচ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়াই অজ্ঞ লোকের এইরূপ বোধ। আন্তর সৌন্দর্য্যের প্রতি অল্প লোকেরই দৃষ্টি আছে। ভগবান্ পূর্ণ-অনন্ত সুন্দর। তাঁহার বিরচিত বিশ্বের কোন পদার্থই অসুন্দর হইতে পারে না। তবে যে আমরা সকল পদার্থই সুন্দর দেখি না, আমাদের অপূর্ণতাই ইহার কারণ। অনুবীক্ষণ-সাহায্যে ক্ষুদ্র মক্ষিকা যে কত সুন্দর, তাহা বুঝা যায়। অন্তর্দৃষ্টিশক্তি সম্যক্ বর্দ্ধিত ও সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের স্বাস্থ্যকর, সমুচিত বিকাশ হইলে, বিশ্ব সৌন্দর্য্যময় বলিয়া প্রতীতি হওয়া সম্ভবপর।

প্রাকৃতিক নিয়মের বৈষম্যে, শিক্ষা ও জ্ঞানের তারতম্যে, ভিন্ন ভিন্ন সমাজে, কাল, পাত্র ও অবস্থা ভেদে সৌন্দর্য্যজ্ঞানের বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। ইংলণ্ড শীতপ্রধান দেশ, সেখানে উষ্ণতা, তাপ বড়ই সুন্দর, বড়ই মধুর। কাব্যসাহিত্যেও এই দুই শব্দের (warmth, heat) মধ্যে একটা মাধুর্য্য ও আকর্ষণ আছে। কিন্তু গ্রীষ্মপ্রধান ভারতে শৈত্যের প্রতি অনুরাগ স্বাভাবিক। কাব্যেও শীতল শব্দের একটা প্রাণ-মন-শীতলকারী সরসতা আছে, রসভাব আছে। ভারতে শৈত্য প্রীতিপ্রদ, সুন্দর। পাশ্চাত্যদেশে নবদম্পতির নিঃসঙ্কোচ বিহার, বঙ্গদেশে বর-বধূর সঙ্কুচিতভাব, সুন্দর। মাতালের নিকট বোতলের লালজল কেমন সুন্দর, সুপেয়! সংযমীর নিকট ইহা কুৎসিত, অপেয়। উচ্ছৃঙ্খল, কলুষিতচিত্ত যুবকের নিকট থিয়েটারের আদিরসাশ্রিত সঙ্গীত কেমন সুশ্রাব্য, সুন্দর! চরিত্রবান্ জিতেন্দ্রিয় যুবার কাছে উহা অশ্রাব্য, কদর্য্য।

সুন্দরের উপাসনা অল্পাধিক পরিমাণে অনেকেই করে ও করিতে চায়। কিন্তু শিশুর সুন্দর মাটির পুতুল যুবার চিত্তাকর্ষক নহে। অসভ্য নাগা-কুকির পক্ষিপালকাদিতে রুচি, সভ্যতার বাতাসে উড়িয়া যায়। আবার, সভ্যসমাজেও শিক্ষার দোষে কুৎসিত সুন্দর হয়, সুন্দর কুৎসিত হয়। পবিত্রতা জিনিষটী সুন্দর। একথায় কেহই দ্বিরুক্তি করিবেন না। কিন্তু একের চক্ষে যাহা পবিত্র, অন্যের চক্ষে তাহাই অপবিত্র হইতে পারে। এই প্রকারে সুন্দর-কুৎসিত লইয়া লোকসমাজে মতভেদ ঘটে। কোন কোন লোক বা সমাজ এই অবস্থায় সুন্দরের উপাসনা করিতে যাইয়া কুৎসিতেরই ভজনা করিয়া থাকে। ইহা অনিষ্টজনক। সুতরাং এই বিষয়ের শিক্ষা চাই,

স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যরুচিকে যথার্থ পথে পরিচালিত করা, মার্জ্জিত করা ও তাহার উৎকর্ষ বিধান করা চাই। সুন্দরকে বাছিয়া লওয়া চাই। নতুবা সুন্দরের পূজা করিতে যাইয়া, অজ্ঞতা বা অন্ধতাদোষে যে সমাজ বা ব্যক্তি কুৎসিতের পূজা করিতে থাকে, সেই সমাজ বা ব্যক্তির আত্মা কলুষিত হয়।

চিরসুন্দর ভগবানের সৃষ্টিতে কিছুই কুৎসিত নহে, তবে মানুষের গড়া জিনিষের মধ্যে সুন্দর, কুৎসিত দুই-ই আছে। মানুষ নিজের সৃষ্ট, গঠিত চরিত্রদোষে বা গুণে নিজেই কুৎসিত বা সুন্দর হইয়া পড়ে। প্রকৃত সৌন্দর্য্যবোধ জাগ্রত হইলে, নিজকে কুৎসিত দেখিতে ও দেখাইতে আর ইচ্ছা জন্মে না। তখন নিজের ও সমাজের দোষ সংস্কারপূর্ব্বক নিজকে ও সমাজকে সুন্দর করিতে বলবতী ইচ্ছা জন্মে।

কাব্য-সাহিত্য-সঙ্গীত ও সৌন্দর্য্যজ্ঞান পরস্পর পরস্পরের সহায়। কাব্যের অনুশীলনে সৌন্দর্য্যজ্ঞানের বিশুদ্ধতা জন্মে; এবং সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের উদয় ও উৎকর্ষে কাব্যের প্রকৃত রসাস্বাদ পাওয়া যায়। এই বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন না হইলে মনুষ্যোচিত বিশ্রামসুখের অত্যল্পতা ও অগৌরব হইয়া থাকে।

কাব্য দুই প্রকার,—ঈশ্বর-কবির কাব্য, আর মানুষ-কবির কাব্য। উভয়বিধ কাব্যই মানুষের ভোগ্য। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের উপাসক কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ (Wordsworth) বলিয়াছেন,

"My heart leaps up when I behold
A rainbow in the sky:
So was it when my life began,
So is it now I am a man;
So be it when I shall grow old,
Or let me die."

অর্থাৎ

হিয়া মোর নেচে ওঠে, আকাশের গায়
ইন্দ্রধনু নেহারি যখন ;
নাচিত এম্নি যখন আছিনু বালক,
• নাচে এম্নি এখন যে হইনু যুবক ;
নাচে যেন এম্নিভাবে বার্দ্ধক্য-দশায়,
হোক মোর নতুবা মরণ।

কবি, প্রকৃতির ভিতরে যে সৌন্দর্য্যরস পাইতেন, তাহাতে ডুবিয়া থাকিতে ভাল বাসিতেন। এই প্রকার নির্ম্মল আনন্দে বঞ্চিত হইয়া জীবনধারণ করা কবির অসহনীয়। যে আনন্দে কবির হৃদয় নাচিত, যে নীরবসঙ্গীত কবির হৃদয়কে নাচাইত, তাহা কার না স্পৃহণীয় ? বস্তুতঃ আনন্দবিচ্যুত হইয়া বাঁচিয়া থাকা বিড়ম্বনামাত্র। আদিকবি বিশ্বপতি নারায়ণ যে বিশ্বকাব্য রচনা করিয়াছেন, তাহার প্রতিপত্রছত্র কবিত্বপূর্ণ। এই কবিত্ব যিনি আস্বাদন করিতে পারেন, যিনি বিশ্বময় সৌন্দর্য্য দেখেন, তিনি কবি। তিনি সৌন্দর্য্যের প্রকৃত উপাসক। বিশ্বকাব্যের ভিতর দিয়া বিশ্ব-কবিকে বুঝিতে পারিলে, সুন্দরের পূজা সম্পূর্ণ হয়।

যাঁহা হইতে প্রেম-গঙ্গার ত্রিধারা স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পাতালে প্রবাহিত, সেই অনন্তসুন্দর, ভুবনমোহন ভগবানের নিত্য-নব, নিত্য-বিকসিত, চির-সৌরভময়, স্নিগ্ধ-শীতল চরণপদ্মে মন আকৃষ্ট হইলেই সৌন্দর্য্যজ্ঞানের সুন্দর সার্থকতা। নিজে সুন্দর হইয়া, সমাজস্থ পরিজনকে সুন্দর করিয়া, খণ্ড ও ক্ষণিক সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণ সেই চিরসুন্দরের চরণে মনকে চিরমগ্ন রাখা সৌন্দর্য্যজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ।

কি শিখিব ?

আমরা এখানে কি শিখিতে আসিয়াছি ? কি শিখিব ? বিশ্ব-মানবের এই প্রশ্নের উত্তরে প্রকৃতিদেবী নীরব-ভাষায় বলিবেন—এই বিশ্ব একটি প্রকাণ্ড জীবন্ত বিদ্যালয়, এই বিদ্যালয়ে তোমরা মনুষ্যত্ব শিক্ষা করিবে। তোমরা মনুষ্যদেহ লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ, মানুষ হইতে শিখিবে। যাও, ঐ অভ্রংলিহ, তুষার-ধবল শৈলরাজের নিকট কত অমূল্য রত্ন লাভ করিতে পারিবে। ঐ যে কল্লোলিনী কলকলনাদে শ্যামলতটপ্রান্ত চুমিয়া কার প্রেমে কোথায় ছুটিয়া যাইতেছে, উহার নিকট কত প্রেমের কথা শিখিতে পারিবে। ঐ যে ভীষণ শ্বাপদসঙ্কুল নিবিড় অরণ্যানী, ঐ যে ঊর্দ্ধে মহাব্যোম, ঐ যে নীল ফেনিল মহাসিন্ধু, ঐ রবি-শশী, ঐ তারা, তারা তোমাদিগকে দিনরাত কত কি মধুর-গভীর উপদেশ দিবার জন্য আহ্বান করিতেছে। পর্ব্বত-প্রান্তর, সরিৎ-সমুদ্রের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন কর। পর্ব্বতের সহিত প্রেমালিঙ্গন কর, নদীকে ভাল করিয়া চিনিয়া লও, সরোবরের কমলিনী, কুমুদিনী লইয়া খেলা কর, গ্রহনক্ষত্রের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ কর। ইহাতে তোমাদের মানসিক বৃত্তির সুন্দর বিকাশ হইবে, দেহ-মন সুস্থ ও প্রফুল্ল থাকিবে। আবার, বহুবিচিত্র মানব-সমাজে বৈচিত্রপূর্ণ মানবচরিত্র অধ্যয়ন করিতে থাক, অভিজ্ঞতা লাভ হইবে। শিশুর অকারণ হাসি-কান্না, খলের খলতা, সাধুর পবিত্রতা, কামিনী-হৃদয়ের কমনীয়তা দেখিয়া শুনিয়া হরষে বিহ্বল ও বিস্ময়ে অভিভূত

হইবে। পিপীলিকা হইতে মদমত্তমাতঙ্গ প্রভৃতি ক্ষুদ্র-বৃহৎ সকল প্রাণীর নিকট জ্ঞান অর্জ্জন কর, ধন্য হইতে পারিবে।

মনুষ্যত্ব জিনিষটা কি ? আমি ধনী জমিদার, তা হইলেই আমি মানুষ হইলাম না। সুরম্য-সপ্ততল-হর্ম্ম্য-নিবাসী আমি বিলাসিতায় গা ঢালিয়া দিয়া পশুর ন্যায় কেবল ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করিতেছি, তোমরা আমাকে মানুষ বলিবে কি ? তবেই, মনুষ্যত্ব ধনসম্পদে প্রতিষ্ঠিত নহে। আমি অতি উচ্চবংশে জন্মিয়াছি, আমি কুলীন, তা বলিয়াই কি আমি মানুষ হইলাম ? এদিকে কিন্তু, কুলীন হইয়া কুকার্য্যে রত, গঞ্জিকাসেবনে ব্যস্ত ! তবেই বলিতে হয়, মনুষ্যত্ব কুলমর্য্যাদামূলক নহে। আমি বিদ্বান্, অনেক বিদ্যা ও উপাধি লাভ করিয়াছি, কিন্তু চিরদিনের জন্য স্বাস্থ্য হারাইয়াছি, চিররুগ্ণ হইয়া অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি। এ অবস্থায় কে আমাকে মানুষ বলিবে ? বস্তুতঃ বিদ্যা ও উপাধির উপর মনুষ্যত্ব নির্ভর করে না। মনুষ্যত্ব জাতিবর্ণগত নহে, দেশকালে সীমাবদ্ধ নহে। তুমি আমি সকলেই মনুষ্যত্বের অধিকারী, ইহা কাহারো একচেটিয়া নহে।

মধুতে মধুরতা না থাকিলে মধুই নয়, অগ্নিতে উত্তাপ না থাকিলে অগ্নির অস্তিত্বই থাকে না। সেইরূপ, মনুষ্য-আকৃতিতে মনুষ্যত্ব না থাকিলে মনুষ্যই নয়। একখানি জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ডকে অগ্নি বলি, কারণ, তাহাতে দগ্ধ করিবার শক্তি আছে। আগুন নিভিয়া গেলে, ছাই-ভস্ম, অঙ্গার বলি। সেইরূপ, মানুষের মধ্যে এমন কিছু আছে, যাহা না থাকিলে, সে ছাই-ভস্ম অঙ্গারের মতন একটা হেয়, তুচ্ছ অপদার্থ। সেই কিছুই মনুষ্যত্ব। মনুষ্যত্ব বলিতে মানুষের শক্তি বা গুণের সমষ্টি বুঝায়। মানুষের দুই ভাগ—বাহির ও ভিতর, শরীর ও

অন্তর। এই দুই লইয়াই মানুষ, এই দুয়েরই সম্যক্ উন্নতিতে মনুষ্যত্ব। শারীর ও আন্তর শক্তির স্বাস্থ্যকর বিকাশে মনুষ্যত্ব। জ্ঞান, দয়া, প্রীতি প্রভৃতি সদ্‌বৃত্তিসমূহের দিব্য স্ফুরণে ও ক্রোধ-লোভাদি অসদ্‌বৃত্তির দমনে মনুষ্যত্ব।

চরিত্র মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। সত্যানুরাগ, সৎসাহস, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও স্বতন্ত্রতা প্রভৃতি গুণাবলী মানুষের অনুষ্ঠিত কর্ম্মের ভিতর দিয়া আত্ম-প্রকাশ করে। চরিত্র মানবের অমূল্য সম্পত্তি। চরিত্রবান্ ব্যক্তিগণ নির্ধন হইলেও ধনী, ধনী অপেক্ষাও ধনবান্; নিরক্ষর হইলেও জ্ঞানী, জ্ঞানী অপেক্ষাও জ্ঞানবান্। ইঁহারা সমাজের শক্তি, জাতির গৌরব। শক্তিশালী পুরুষেরা নিজের পথ নিজে করিয়া লন এবং অপর সকলকেও সেই পথে টানিয়া আনেন। ইঁহাদের প্রতিকার্য্যেই একটা ব্যক্তিত্ব, বিশেষত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে। প্রবল ইচ্ছাশক্তি, প্রখর কর্ত্তব্য-জ্ঞান, অদম্য কর্ম্মশক্তি ইঁহাদিগকে মহিমান্বিত করিয়া তোলে। সকল সমাজেই মহতের সংখ্যা অল্প। সুতরাং কেবল মহৎলোক লইয়াই জাতির বলাবল, গুণাগুণ বিচার করা চলে না। সমাজস্থ অধিকাংশ লোকের মধ্যে যে চরিত্র বিদ্যমান, তাহাতেই জাতির উৎকর্ষাপকর্ষ নির্ণীত হইয়া থাকে। বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভা সকলের সমান থাকে না, কিন্তু সকলেই চরিত্রগঠন করিবার জন্য,—সত্যবান্, ন্যায়নিষ্ঠ, সাধু, সাহসী, ধার্ম্মিক হইবার জন্য চেষ্টা করিতে ন্যায়তঃ বাধ্য। চরিত্রহীনতায় বিদ্যা-বুদ্ধি-প্রতিভা সব হীনপ্রভ। চরিত্ররত্ন লাভ করা শিক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল। সকল শিক্ষার সার মনুষ্যত্ব শিক্ষা। শারীরিক, মানসিক বা চরিত্রগত দুর্ব্বলতা মনুষ্যত্বের অন্তরায়। এই সকল দুর্ব্বলতা যার যত কমিতে থাকিবে, তিনি মনুষ্যত্বের দিকে ততই অগ্রসর হইতে পারিবেন।

কি শিখিব?

শিখিব আমরা দুর্ব্বলতা দূর করিতে। শিখিব আমরা মানুষ হইতে।

গুণের পূজা।

"গুণাঃ পূজাস্থানং গুণিষু ন চ লিঙ্গং ন চ বয়ঃ।

বাগানে যখন গোলাপ, বেল, যূঁই প্রভৃতি নানা রকমের ফুল ফুটিয়া, সৌরভ-সৌন্দর্য্য ঢালিয়া দিয়া, সহৃদয় দর্শকের ঘ্রাণতর্পণ ও নয়ন-মন বিমোহন করে, সুরসিক সমীরণ আসিয়া চারিদিকে সুখের বার্ত্তা বহন করে, পতঙ্গকুল সংবাদ পাইয়া দূর হইতে উড়িয়া আসে, অলি গুন্ গুন্ রবে মধু আহরণে বসিয়া যায়, তখন কেমন একটা আনন্দের বাজার বসে! কিন্তু গো-গর্দ্দভ, মেষ-মহিষ প্রভৃতি পশু, বাগানে প্রবেশ করিতে পারিলেই ফুলপল্লব সব খাইয়া ফেলে, সৌন্দর্য্য নষ্ট করে। মধুকরের পুষ্পরস পানের ন্যায় সুমানুষের পক্ষেও গুণগ্রহণ স্বাভাবিক। "গুণী গুণং বেত্তি, ন বেত্তি নির্গুণঃ।" গুণীই গুণীর গুণ বোঝে ও আদর করে। গবাদি পশুর ন্যায় নির্গুণ অরসিক ব্যক্তির কাছে গুণের কোন মুল্য নাই, আদর নাই। "পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙ্গে হীরার ধার"।

কবি কবিকে, বীর বীরকে যেমন বোঝে ও আদর করে এমন আর কে পারে? মিথিলার পণ্ডিত-কবি বিদ্যাপতি ও বঙ্গের স্বভাব-কবি চণ্ডিদাস এই দুইজনের মধ্যে মিলনের কেমন একটা প্রাণের

আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল! চুম্বকাকর্ষণের ন্যায় গুণের আকর্ষণে দুজনেই কেমন আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণতনয় বীর চন্দ্রকেতু, মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে আগত, অজ্ঞাত লবের বীরত্বে কেমন মুগ্ধ হইয়াছিলেন, বীরত্বের মর্য্যাদা কেমন রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। ইহা কাব্যের কথা হইলেও গুণিসমাজে এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। কৃষ্ণার্জ্জুন উভয়েই উভয়ের গুণে মুগ্ধ। ইঁহাদের সখ্যভাব কি অকৃত্রিম, কি পবিত্র-মধুর!

আবহমানকাল হইতে সকল স্বস্থ-সভ্য সমাজেই গুণের আদর হইয়া আসিতেছে। গুণের পূজা না থাকিলে মনুষ্যসমাজ পশুর সমাজে পরিণত হইত। রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, চৈতন্য কেহই অমরত্ব লাভ করিতে পারিতেন না, কেহই লোকপূজা পাইতেন না। মানবসমাজেরও পশুত্ব ঘুচিত না। যাঁহারা গুণের পক্ষপাতী, তাঁহারাই ঈদৃশ মহাত্মাদিগের ভক্ত এবং তাঁহারাই ইঁহাদের চরণে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি দিয়া থাকেন।

মানবসমাজ যেমন গুণের নিকট তেমন গুণগ্রাহীর নিকটও অশেষ ঋণে ঋণী।

উদ্যানপ্রিয়, রসজ্ঞ ব্যক্তি যেমন নানা স্থান হইতে নানা সুগন্ধি-ফুলের গাছ আনাইয়া সযত্নে নিজের বাগানে রোপণ করে, সেইরূপ গুণজ্ঞ মহারাজ বিক্রমাদিত্য, নানা জনপদ, নগর হইতে আহরণ করিয়া নবরত্ন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন বলিয়া, লোকচক্ষুর অন্তরালে কোথায় লুকাইয়া থাকিয়া, এখনও কোন কোন রত্ন আমাদিগকে আলোক বিতরণ করিতেছে। মহামনা আকবর গুণী লোকদিগকে স্বীয় রাজ-ধানীতে সমাদরে আশ্রয় প্রদান করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় দিয়াছেন।

তদীয় সমাজ উপকৃত হইয়াছে। ঈদৃশ গুণগ্রাহী মহানুভব ব্যক্তিগণের নিকট মানবসমাজ বিশেষ উপকৃত।

লোকে গুণেরই পূজা করিয়া থাকে, আধারের পূজা করে না। পুরুষ হউক, স্ত্রী হউক, বালক হউক আর বৃদ্ধই হউক, গুণ থাকিলেই লোকে তাহার সমাদর করে। স্ত্রী বা বালক বলিয়া কেহ অনাদর করে না।

"নৈসর্গিকী সুরভিনঃ কুসুমস্য সিদ্ধা,
মূর্দ্ধ্নি স্থিতির্ন চরণৈরবতাড়নানি।"

সুরভিকুসুমকে লোকে স্বভাবতঃই আদর করিয়া মস্তকে ধারণ করে, পদে দলন করে না। রমণী বলিয়া সীতা, গার্গী, ধাত্রী পান্না কি অনাদরণীয়া? অভিমন্যু, পুত্ত, ক্যাসাবিয়াঙ্কা (Casabianca) বালক বলিয়া কি পূজার অযোগ্য? "তেজসাং হি ন বয়ঃ সমীক্ষ্যতে।" তেজস্বীর বয়স বিচার কেহ করে না। যদি কোন ব্যক্তি বা কোন সমাজ ঈদৃশ গুণী পুরুষ, রমণী বা বালককে অনাদর করে, তবে সেই ব্যক্তি বা সমাজ নিশ্চয়ই মূঢ়, বিকারপ্রাপ্ত। মিত্র-অমিত্র, মানুষ-অমানুষ, চেতন-অচেতন, যার মধ্যে গুণ আছে, বুদ্ধিমান্ সমাজ তারই গুণ বুঝিয়া আদর করে। আদর করিয়া লাভবান্ হয়।

গুণের পূজা করিলে লাভবান্ কে? গুণ বা গুণের স্তাবক? বনে ফুল ফুটিয়া সৌরভ ঢালিয়া দিতেছে, তুমি আদর কর, আর নাই কর, তাতে তার লাভালাভ কি? মাথায় তুলিয়া নিলেও তার লাভ নাই, না নিলেও ক্ষতি নাই। সমুদ্রগর্ভে কত উজ্জ্বল রত্ন আছে, তুমি তাহা আহরণ করিয়া আনিয়া আদর কর, আর নাই কর, তাতে তার লাভ লোকসান কি? লাভ তোমার। ফুলের সুঘ্রাণে তোমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের

আহ্লাদ জন্মিবে। রত্ন তোমার আঁধার গৃহকে আলোকিত করিবে। লাভ তোমার। নিষ্কাম, সাধু মহাত্মার মহিমা বুঝিতে পার, মহচ্চরিত্রের পূজা করিতে পার, তোমার চরিত্র উন্নত হইবে, তুমি সুখী হইবে। পূজা না কর, তুমি ঠকিবে। মহাত্মার লাভালাভ নাই। যে সমাজ মহতের পূজা বা গুণীর আদর করে না, সেই সমাজেরই ক্ষতি।

পুণ্যশ্লোক জ্ঞানী, কবি ও কর্ম্মবীরগণ যে জ্ঞান, কাব্য ও চরিত্ররূপ অমূল্য সম্পত্তি ধরাধামে রাখিয়া অমরধামে চলিয়া যান, তাহা দ্বারা লোকসমাজ চিরকাল উপকৃত হইতে থাকে ও থাকিবে। সমাজ যদি সেই সম্পত্তি ভোগ না করে, তবে সমাজের ক্ষতি।

গুণ বুঝিতে জ্ঞানের, মাথায় তুলিয়া লইতে হৃদয়ের প্রয়োজন। সুগন্ধি ফুল হাতে পাইয়া যদি তার গন্ধ কেহ না পায়, তবে তাহার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দোষ জন্মিয়াছে, বুঝিতে হইবে। গন্ধ পাইয়াও যদি কাহারো হৃদয় প্রফুল্ল না হয়, তবে সে হৃদয়হীন। যে সমাজ গুণীর গুণ বোঝে না, বুঝিয়া আদর করে না, সেই সমাজের নিশ্চয়ই বিকার উপস্থিত হইয়াছে অথবা কিছুর অভাব হইয়াছে। অভাব—জ্ঞানের, অভাব—হৃদয়ের।

পাশ্চাত্যসমাজে গুণের পূজার একটা বিপুল ঘটা হইয়া থাকে। এই বাহ্য আড়ম্বরের বিলক্ষণ উপকারিতা আছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স বা জর্ম্মণি, যে দেশেই কোন মহাত্মা কোন মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিলেন, তখনই সমগ্র য়ুরোপ প্রাণ খুলিয়া তাঁহার সম্মান-সম্বর্দ্ধনা করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ও গুণগ্রাহিতার পরিচয় দেয়। সমগ্র মহাদেশ যেন একটা হৃদয় লইয়া আনন্দে নাচিতে থাকে। ইহাতে

সমাজের সজীবতা, বুদ্ধিমত্তা ও সহৃদয়তা প্রকাশ পায়। আর প্রকাশ পায়—পুরুষত্ব। কারণ, গুণে অনুরাগ, পুরুষের একটী লক্ষণ। ব্যক্তি সকলও গুণী হইবার জন্য উৎসাহান্বিত হয়। কিন্তু এই হত-ভাগ্য দেশে কোন মহাত্মার আবির্ভাব হইলে, দেশে আদর না পাইয়া তাঁহাকে বিদেশের শরণ লইতে হয়, বিদেশীর মুখপানে তাকাইতে হয়। ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে যদি তাঁহার প্রশংসা বাহির হইল, তখন আমরাও বলি, হাঁ, ইঁহার গুণ আছে বটে, নহিলে ঐ সকল দেশ প্রশংসা করিবে কেন? তখন বঙ্গদেশও দুর্ব্বল ক্ষীণকণ্ঠে তাঁহার একটু স্তবস্তুতি গাহিতে লাগিল, কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। সে স্তব-স্তুতিতে প্রাণের আবেগ নাই। হৃদয়হীন বক্তার বক্তৃতার ন্যায় শ্রোতার শ্রুতিমাত্র স্পর্শ করিয়া সেই প্রশংসাধ্বনি আকাশে বিলীন হইয়া যায়। যেন বলিয়া যায়,—হে গুণিন্! এই সমাজ তোমার গুণে মুগ্ধ নহে, তোমার গুণের পূজা করিতে প্রস্তুত নহে। এ দেশ নির্গুণের পূজায় ব্যস্ত। এ হেন দেশে তোমার জন্ম না হইলেই ভাল হইত!

গুণীর উপেক্ষায় সমাজের অমঙ্গল, ততোধিক অমঙ্গল নির্গুণের পূজায়। গুণীর অনাদর ও গুণহীনের সমাদর অস্বাভাবিক হইলেও আমাদের ইহাই যেন স্বভাব হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এখানে গুণীর পূজা না হইয়া নির্গুণের পূজা হয়, একথায় সমা-জের বড় ক্রোধ ও দুঃখ। সমাজের কথা এই যে, আমরা যেমন গুণীর পূজা করি, এমন আর কোন আধুনিক সভ্যসমাজ করে না। আমরা গুণীর সম্মান করিতে যাইয়া তাঁহার পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্র, সমস্ত বংশটাকেই পূজা করিয়া থাকি, এমন আর কোন্ দেশে করা হয়? অর্থাৎ যে কুলের মর্য্যাদা করিয়া আসিতেছি, সেই কুল-প্রতিষ্ঠাতা

মহাত্মার বাড়ী কোথায়, তিনি কোন্ কোন্ গুণে মণ্ডিত ছিলেন, কি কারণে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, ইত্যাদি কিছুই অবগত নহি, তাঁহার সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানি না, জানিবার ইচ্ছাও রাখি না। তাঁহাকে একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি। কিন্তু তাঁহার বংশধর অজ্ঞ, অসৎ, দুরাচার হইলেও সেই গুণধরকে আমরা অর্ঘ্য প্রদান করি, কেবল তাহার সেই গুণী পূর্ব্বপুরুষের খাতিরে, কেবল তাঁহার প্রতি ভক্তি দেখাইবার জন্য। এমন কোন্ সমাজে করা হয় ?

ইহা সত্যকথা, কিন্তু এইরূপ কুলমর্য্যাদায় সমাজের লাভ কি ক্ষতি ?

বিদ্বানের পুত্র মূর্খ, সাধুর পুত্র অসাধু, পুণ্যবানের পুত্র পাপী, সমাজে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। মূর্খ, পামর, পাপাকে সমাদর করিতে কাহারও স্বতঃপ্রবৃত্তি জন্মে না। কিন্তু সমাজ যদি বলপূর্ব্বক জনসাধারণকে বলে,—মূর্খতা, দুশ্চরিত্রতা ও পাপকে আদর করিতেই হইবে, এবং সেই সমাজের লোকেরা, সেকালের গুরুমহাশয়ের লগুড়াঘাতের ন্যায় নির্দ্দয় কশাঘাত পৃষ্ঠে পতিত হইবে, এই ভয়ে তথাস্তু বলিয়া সমাজের শাসন মানিয়া চলে, তবে পাপ, মূর্খতা সমাজ-বক্ষে সগর্ব্বে আস্ফালন করিয়া ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিবে। আর একদিকে নীচকুলোদ্ভব মূর্খের পুত্র বিদ্বান্, অসাধুর পুত্র সাধু হইয়া উঠিলেন ; তদীয় বিদ্যাবত্তা, সাধুতা প্রভৃতি গুণে লোকের মন আকৃষ্ট হইতে দেখিয়া সমাজ যদি চোখ্ রাঙাইয়া, তর্জ্জনী হেলাইয়া তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতে থাকে, আর লোকে পূর্ব্ববৎ ভয়ে ভয়ে তদীয় গুণে অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তবে ঐ সদ্‌গুণাবলী নিরাশ্রয় লতার ন্যায় সঙ্কুচিত, শুষ্ক হইতে থাকে। বংশমর্য্যাদার চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ক্রমে সমাজ-মধ্যে মূর্খতা, মিথ্যাচার প্রভৃতি দুশ্চরিত্রতা তাণ্ডবনৃত্য

করিতে থাকে; আর পবিত্রতা, সাধুতা শুকাইয়া মরিতে থাকে। কেননা পাপের শাসন নাই, সম্মান আছে। পুণ্যের আদর নাই, লাঞ্ছনা আছে। কিন্তু আশ্রয়-আদর পাইলে লতার ন্যায় গুণাবলী লতাইয়া লতাইয়া কেবল বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

কুলীনকুলের অন্যতম আদিপুরুষ বেণীসংহার নাটকের কবি ভট্টনারায়ণ কর্ণের মুখে বলিয়াছেন ঃ—

"সূতো বা সূতপুত্রো বা যো বা সো বা ভবাম্যহম্।
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মদায়ত্তং তু পৌরুষম্॥"

একদিন অশ্বত্থামা ও কর্ণের মধ্যে কলহ বাধিয়া গেল। অশ্বত্থামা কর্ণকে সূত, সূতপুত্র, ছোটলোক বলিয়া গালি দিলে, কর্ণ বলিলেন,—আমি সূত হই আর সূতপুত্রই হই, যে-সে কেন হই না, তাতে কি আসে যায়? উচ্চ বা নীচকুলে জন্মসম্বন্ধে কাহারও কোন হাত নাই, তাহা দৈবাধীন; কিন্তু পৌরুষ-বীর্য্য, যাহা পুরুষের আয়ত্ত, তাহা আমার আছে। আছে কিনা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ। সমাজ কি কর্ণের এ কথায় কর্ণপাত করিবেন?

হায়! আমরা ভুলিয়া যাই যে,—গুণ নন্দনকাননের ফুল, দেবতার দান। মাথায় তুলিয়া না নিলে অধর্ম্ম-অমঙ্গল হইবে। দেবতা অসন্তুষ্ট হইবেন।

কোন কোন অঞ্চলে এক গাছের নৌকা তৈয়ার হয়। প্রকাণ্ড সারবান্ বৃক্ষ বন হইতে কাটিয়া আনিয়া ভিতরের সারগুলি ফেলিয়া অসার বাকল দিয়া লোকে নৌকা তৈয়ার করে। সাররক্ষা করিলে হয়ত একশত টাকা লাভ হইত, নৌকার মূল্য সম্ভবতঃ দশ টাকামাত্র। এই প্রকার নৌকা নির্ম্মাণ করে যে, সে নিজের অজ্ঞতা বোঝে না,

সে যে ঠকে তা বোঝে না। যদি কেহ বুঝাইতে যায়, তবে হয়ত সে রাগ করিবে, না হয় তাহাকে বুঝাইয়া বলিবে যে, বাকলের নৌকা তৈয়ার করিয়া তার বেশ লাভ হয়। সার লইয়া কি হইবে? হায়! "নির্গুণ মানুষের তিনগুণ জ্বালা"। প্রায় সকল বিষয়েই এই প্রকার অসারগ্রাহিতা ও সারসংহারিতা যে সমাজে বর্ত্তমান, সে সমাজ লাভবান্ বা ক্ষতিগ্রস্ত, বুদ্ধিমান্ কি তদ্বিপরীত, তাহা কে কারে বুঝাইবে? কারণ, নির্গুণ সমাজেরও তিনগুণ জ্বালা!

গুণী গুণকে গুণ বলিয়া আদর করেন, নির্গুণ ব্যক্তি গুণকে দোষ বলিয়া বোঝে। নির্গুণ সমাজে দোষের আদর দেখিতে দেখিতে অভ্যস্ত হইয়া গেলে লোকের গুণগ্রহণশক্তি লোপ পায়। গুণের অনাদরে সমাজ কেবল নির্গুণেরই জন্ম দেয়। পুরুষত্বের উপেক্ষায় সমাজে কেবলই কাপুরুষ জন্মে। তখন শক্তিহীন ব্যক্তিদিগকে লইয়াই সমাজ গঠিত হয়। তখন সমাজে দুর্ব্বলতার পূজা চলিতে থাকে।

কি শিখিব?

শিখিব আমরা গুণকে বরণ করিতে। শিখিব আমরা গুণীর গলায় মালা দিতে।

ভীরুতা ও সাহস।

অব্যবসায়িনমলসং দৈবপরং সাহসাচ্চ পরিহীনম্।
......................নেচ্ছত্যুপগৃহিতুং লক্ষ্মীঃ॥

হিতোপদেশ।

ক্ষুদ্র, ইতর প্রাণীর নিকটও আমরা অনেক অমূল্য উপদেশ লাভ করিতে পারি। অলসজীবন কত কদর্য্য, ঘৃণিত, তাহা আমেরিকার স্লথ (Sloth) নামক জন্তুর চরিত্রে বিলক্ষণ প্রকাশ পায়। সেইরূপ, ভীরুর জীবন অতি তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর হইলেও জগৎকে এই শিক্ষা দেয় যে, জয়শ্রী সাহসীকেই বরণ করে, ভীরুকে বরণ করে না।

আমরা পিপীলিকার নিকট সাহসের উপদেশলাভ করিয়া, তদনুসারে কার্য্য করিয়া, কৃতার্থ হইতে পারি। পিপীলিকা অতি ক্ষুদ্রকায় লইয়া বলশালী। শরীরের চতুর্গুণ আয়তন, দশগুণ ভারী, একটা অন্ন বহন করিয়া গন্তব্য স্থানে যাইতে কত যত্ন, কত শ্রম করে, ভাবিলে বিস্ময় জন্মে। এই ক্ষুদ্রদেহে এত বল কে দিল? উত্তর,—সাহস। আবার, কত পিপীলিকা দল বাঁধিয়া তাহার সাহায্যের জন্য কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। ইহারা প্রাণপাত করিবে, তথাপি আরব্ধ কার্য্য ছাড়িবে না। কোন কোন অঞ্চলে প্রাচীনারা এখনও দুধে চিনি দিবার সময়, পিপ্ড়ে থাকিলে বালকদিগকে বলিয়া থাকেন,—খাও, পিপ্ড়ে খাইলে বল হবে, সাঁতার শিখ্বে। একথার অর্থ এই যে, তোমরা সকলে পিপীলিকার ন্যায় সাহসী হও; পিপীলিকার সাহসে বুক বাঁধিয়া সংসার-সমুদ্রে সাঁতার দিতে শিখ;

শত তরঙ্গাঘাতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া অধ্যবসায় ও সাহসের বলে সাঁতার দেও, কূল পাইবে।

সাহসে দেহ ও মনে বল আসে, ভীরুতা বল হরণ করে। তরুণ যুবক ফরিদ—যিনি উত্তরকালে সেরশাহ উপাধি লইয়া দিল্লীর বাদসাহ হইয়াছিলেন—সেই ফরিদ দ্বিতীয় যমস্বরূপ, ভীমকায় ব্যাঘ্রের নিকট যাইয়া তাকে নিদ্রা হইতে জাগাইয়া বধ করিয়াছিলেন। ইহাতে ফরিদের শারীরিক বিশেষতঃ মানসিক বলের কেমন পরিচয় পাওয়া যায়! মামুদশার সৈন্যদলের মধ্যে প্রবীণ বীরপুরুষেরা কেহই বাঘের কাছে যাইতে সাহস পায় নাই। ইহাদের চেয়ে ফরিদের শরীরে বল বেশী না থাকিলেও মনের বল নিশ্চয় বেশী ছিল। বাঘ জাগিয়া যখন ভীষণ গর্জ্জন করিয়া উঠিল, তখন দূর হইতে কত লোক ভয়ে প্রাণ লইয়া পলাইল। ফরিদ কিন্তু নির্ভয়ে তরবারিদ্বারা বাঘের প্রাণ বিনাশ করিলেন, জিহ্বা কাটিয়া আনিলেন।

"বনের বাঘে খায় না, কিন্তু মনের বাঘে খায়।" বনের বাঘে আর কয় জনকে খায়? বনে বাঘের সহিত দেখা সাক্ষাৎ অনেকেরই হয় না। কিন্তু মনের বাঘেই অনেকেরে খাইয়া ফেলে, অনেকের সর্ব্বনাশ করে। 'রোগোন্মাদ' (Hypochondria) রোগী কেমন বিভীষিকা দেখে! এই রোগগ্রস্ত ব্যক্তি কল্পিত রোগ লইয়া কত অশান্তি ভোগ করে। রোগ নাই, তবু রোগের জ্বালায় অস্থির। 'রোগোন্মাদ'এর ন্যায় ভীরুতাও রোগবিশেষ। ভীরু মনে মনে অলীক ভয় কল্পনা করে। জীবন-পথে হাঁটিতে কেবল বাঘ-সাপ দেখিয়া মূর্চ্ছা যায়। মনের বাঘ-সাপ তাড়াইতে না পারিলে রোগ প্রতীকারের আশা অল্প।

ফরিদের ন্যায়, অষ্টাদশবর্ষীয় বালক জগদীশ—যিনি পরবর্ত্তী কালে তর্কালঙ্কার-উপাধি-ভূষিত, অতি শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িক পণ্ডিত হইয়া বঙ্গের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন—সেই বালক জগদীশ প্রকাণ্ড বিষধর সর্প মারিয়া নিজেকে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। বাল্যকালে জগদীশ বড় দুরন্ত ছিলেন। তাঁহার পাখী-ধরা রোগ ছিল। তিনি একদিন পাখীর বাসা দেখিয়া একটা প্রকাণ্ড তালবৃক্ষে উঠিলেন। যাই পাখীর বাসায় হাত দিয়াছেন, অমনি একটা ভয়ঙ্কর সর্প দংশন করিতে উদ্যত হইল। জগদীশ সাপের মুখ হাত দিয়া শক্ত করিয়া চাপিয়া ধরিলেন। সর্প লেজ দিয়া তাঁহার হাত জড়াইয়া ধরিল, জগদীশ তালপাতা দিয়া সাপটাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন। জগদীশ প্রাণে বাঁচিয়া গেলেন, কেবল সাহসের বলে। সাহসের কাছে বাঘ-সাপ কিছুই নয়।

ভীরুতা মানসিক দুর্ব্বলতা বই আর কিছুই নহে। দুর্ব্বলতা-বোধ হইতেই ইহার জন্ম। মানুষ, বাঘ দেখিলে ভয় পায়। কেন? কারণ, সে জানে, বাঘ তাহার অপেক্ষা বলবান্, বাঘের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। কিন্তু, যদি তাহার এরূপ ধ্রুব বিশ্বাস থাকে যে, বাঘ তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না, নিজের এমন শক্তি আছে যে, বাঘের আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবে, তবে সে বাঘকে ভয় করিবে না। ফলতঃ, আত্মশক্তির অভাববোধই ভয়ের কারণ। ভীরুতা আমাদের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে। শক্তিরূপিণী বিশ্বজননী ভীরুর অন্তরেও শক্তির বীজই দিয়াছেন, ভীরুতার বীজ দেন নাই। তবে ভীরুতা আসে কোথা হইতে? জাতীয় ভীরুতার জন্য কেবল সমাজ দায়ী, সামাজিক ও পারি-

বারিক শিক্ষা দায়ী। ভীরু, ভীরুতা ভিন্ন সাহস শিক্ষা দিতে পারে না। বঙ্গীয় শিশু, জন্মিয়াই কত জুজুর ভয়, ভূতের ভয় শিখিতে থাকে। ঘুমপাড়ানি মন্ত্রেও*, শিশু ভয়ের কথাই শুনে, ভয়ে ভয়ে চোখ মুদিয়া থাকে, এবং নিদ্রাবস্থায়ও মাঝে মাঝে আতঙ্কে চমকিয়া উঠে। এই প্রকার ভয়ের শিক্ষা শিশুর স্বভাব হয়। ভীরুসমাজে মানুষ আশৈশব সৎসাহসের পরিবর্ত্তে কেবলই ভয় শিক্ষা করে, উত্তরকালে তাহাই দৃঢ়মূল স্বভাবে পরিণত হয়। বাল্যে কি যৌবনে, গৃহে কি কর্ম্মক্ষেত্রে, ভিতরে কি বাহিরে, কখনও কোথাও যদি কেহ সাহসের শিক্ষা, সাহসের দৃষ্টান্ত না পায়, তবে সে ভীরু ভিন্ন সাহসী হইতে পারে না।

শক্তির অভাব বা অক্ষমতাবোধ সর্ব্বপ্রকার ভয়ের হেতু। এই মূলকারণের মূলোচ্ছেদ করিতে না পারিলে কোন জাতির জাতীয় ভীরুতা নির্ম্মূল হইতে পারে না। শৈশবাবধি শিশুর মনে যাহাতে ভয় না আসিয়া, পুরুষোচিত সাহস জন্মিতে পারে, প্রতি পরিবারে এরূপ শিক্ষাদান একান্ত আবশ্যক। সরল সত্যকথা বলিতে নির্ভীকতা, পাপপ্রলোভনের সহিত সংগ্রাম করিতে সৎসাহস, ন্যায়ের কণ্টকময় পথে চলিতে উৎসাহ ও অধ্যবসায় শিক্ষা দেওয়া প্রত্যেক জনক-জননীর কর্ত্তব্য। মৌখিক বা পুস্তকের লিখিত উপদেশ অপেক্ষা সৎসাহসের দৃষ্টান্ত বহুফলপ্রদ। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বঙ্গসমাজে দৃষ্টান্তের অত্যন্ত অসদ্ভাব। সমাজের সর্ব্বত্রই যেন একটা ভয়ানকরস-প্রধান নাটকের নিত্য অভিনয় চলিতেছে! অভিনেতৃগণ রঙ্গমঞ্চে

---

* "ছেলে ঘুমাল, পাড়া জুড়াল, বর্গী এল দেশে।
বুল্‌বুলিতে ধান খেয়েছে, খাজনা দিব কিসে?

আসিয়া ভয়ের অভিনয় করিয়া থাকেন, দর্শকগণ স্থায়িভাব ভয়কে লইয়া একপ্রকার আনন্দ অনুভব করেন। গ্রামে, নগরে, প্রতি পরিবারে, দিবাযামিনী যে যে নাট্যাঙ্ক অভিনীত হইয়া থাকে, তাহার প্রতিপৃষ্ঠা ভয়ানকরসপূর্ণ। এ অবস্থায় ভীরুতা ভিন্ন সাহস শিক্ষা করা অনেকের পক্ষেই একপ্রকার অসম্ভব। পিতামাতা প্রভৃতি গুরু-জনেরা সাহসী না হইলে কি প্রকারে সন্তানদিগকে সাহসের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবেন ? দৃষ্টান্তের বৈপরীত্যে বা অভাবে উপদেশ নিষ্ফল। ইংলণ্ডের মহাকবি সেক্ষপীর বলিয়াছেন,—Cowards die many times before their deaths" না মরিতে মরে ভীরু কত শতবার। তিনি আরও বলিয়াছেন,—"It seems to me most strange that men should fear" ইহা আমার কাছে বড়ই আশ্চর্য্য বোধ হয় যে, পুরুষ, পুরুষ হইয়া ভয় পায়। ছাত্রগণ এই সকল উপাদেয় উক্তি অতি আগ্রহসহকারে কণ্ঠস্থ করে, চর্ব্বিতচর্ব্বণ করে, কিন্তু ভীরুত্ব দূর করিতে ইচ্ছা করে না, পারে না। আবার—

"ঈর্ষী ঘৃণীত্বসন্তুষ্টঃ ক্রোধনো নিত্যশঙ্কিতঃ।
পরভাগ্যোপজীবী চ ষড়েতে দুঃখভাগিনঃ ॥"

ঈর্ষাবান্, দয়াশীল, অসন্তুষ্ট, কোপনস্বভাব, নিত্যশঙ্কিত (ভীরু), এবং পরভাগ্যোপজীবী এই ছয় ব্যক্তি দুঃখভাগী। এই শ্লোক কণ্ঠস্থ করিয়া কয়জন ভীরু ভীরুত্বাপবাদ হইতে মুক্ত হইয়াছেন ? "No arguments will give courage to the coward" কোন উপদেশ, যুক্তি-তর্ক ভীরুকে সাহস দিতে পারে না।

ভীরুতার কি উপহাসাস্পদ দৈন্য এবং সাহসের কি আশ্চর্য্য মহিমা, তাহা উত্তর-গোগৃহে কৌরব কবল হইতে গোধনরক্ষার্থী উত্তর-

অর্জ্জুনের চরিত্রে কেমন সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে ! উত্তর,—মূর্ত্তিমতী ভীরুতা, অর্জ্জুন—মূর্ত্তিমান্ সাহস। মহারথ-ভীষ্ম-দ্রোণ-পরিচালিত বিপুল কৌরববাহিনী এক অর্জ্জুনের বলে পরাজিত। ইহার কারণ, অর্জ্জুনের দুর্জ্জয় সাহস ও তজ্জনিত অলঙ্ঘ্য, অমিত বল। ইহা জানিয়াই অক্ষক্রীড়ারত যুধিষ্ঠির উত্তর-জনক বিরাট্‌রাজকে আশ্বাস দিয়াছিলেন,—"বৃহন্নলা সারথির্যস্য কুতস্তস্য পরাভবঃ।" বৃহন্নলা যার সারথি, তার পরাভব কোথায় ? বৃহন্নলানামধারী অর্জ্জুন যাহার সহায়, তাহার পরাভব অসম্ভব। যুধিষ্ঠিরের এই প্রবোধবাক্য যেন আমাদের কর্ণকুহরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে। প্রতিধ্বনি যেন বলিতেছে,—সাহস যাহার সারথি, সংসার-সমরে সেই রথীর পরাভব নাই।

মানবের পক্ষে এই সংসার একটী বিপুল বিস্তীর্ণ সমরপ্রাঙ্গণ। এখানে কি ধর্ম্মে, কি দর্শন-বিজ্ঞানে, কি সংস্কারকার্য্যে, কি সাহিত্যে, কি দৈনন্দিন কার্য্যকলাপে, সর্ব্বত্রই সাহসের প্রয়োজন। সর্ব্বত্রই সাহসের জয়, ভীরুতার পরাজয়।

প্রকৃত সাহসী মহাত্মারা কাহাকেও ভয় করেন না, না সমাজকে না যমকে। প্রাচীন গ্রীশদেশে লোকহিতৈষী, জিতেন্দ্রিয় সক্রেটিস প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন, স্বদেশবাসী যুবকদিগকে সৎশিক্ষা দিয়া মানুষ করিয়া তুলিবার অপরাধে। ইচ্ছা করিলে তিনি পলাইয়া গিয়া নিজেকে বাঁচাইতে পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া অকাতরে অম্লান-বদনে দণ্ডগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যম ও যমস্বরূপ সমাজকে ভয় না করিয়া এই প্রকারে মরিয়াই অমর হইয়াছেন। বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও বৃদ্ধ-কালে কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, 'পৃথিবী ঘোরে' এই তত্ত্ব আবিষ্কারের

অপরাধে। মহাপ্রাণ যিশু ধর্ম্মের জন্য, সরল সত্য প্রচারের জন্য প্রাণ দিয়া লোকের প্রাণসঞ্চার করিয়া গিয়াছেন। তাহার ফলে অদ্যাপি যথার্থ খৃষ্টান্, সত্যের জন্য প্রাণপাত করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। ধর্ম্ম-সংস্কার করিতে যাইয়া জর্ম্মেণির মার্টিন লুথারকে কত নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল। পাশ্চাত্যদেশে এই প্রকারে কত মনীষী মহাত্মা সত্য ও ন্যায়ের জন্য সঙ্কীর্ণ, অনুদারনীতিক সমাজের নিকট কত নিষ্ঠুর, অমানুষিক নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন, তাহা তাঁহাদের জীবনবৃত্তে বিবৃত আছে।

তত্তৎকালীন য়ুরোপ-সমাজের ঘোরতর নৃশংসতা স্মরণ করিলে মনে যুগপৎ বিষাদ ও হর্ষের উদয় হয়। বিষাদ—অন্যায় নির্য্যাতনে, হর্ষ—ন্যায়ের জয়দর্শনে। যেমন নূতন তত্ত্ব উদ্ভাবিত হইল, অমনি সমাজ বদ্ধকক্ষ হইয়া সমগ্র বলপ্রয়োগপূর্ব্বক আবিষ্কারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান। আবিষ্কর্ত্তাও পর্ব্বতপ্রমাণ বাধাবিপত্তি, বজ্রদণ্ড, বজ্রাদপি দৃঢ়তর মস্তকে বহন করিতে পর্ব্বতের ন্যায় অচল-অটল। একদিকে সমাজ, অন্য দিকে মহাত্মা একক। একদিকে সেই কৌরব সেনা, অন্য দিকে মহাবীর অর্জ্জুন একা। কিন্তু, 'সত্যমেব জয়তে'। অবশেষে সত্যেরই জয়। "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।" সমাজ অন্যায়-রূপে নিপীড়ন করিয়াই মহাত্মাদিগের মহিমা শত গুণে উজ্জ্বল করিত, চরিত্রের বল সহস্র গুণে বাড়াইয়া তুলিত। ঈদৃশ নির্ভীক মনস্বিগণের অলোকসামান্য সাধুদৃষ্টান্ত পাশ্চাত্য-সমাজের প্রাণের ভিতর তাড়িত সঞ্চার করিয়া দিয়াছে।

কিন্তু ভারতে যিশুর ন্যায় বুদ্ধের প্রাণ দিতে হয় নাই। ভারত-সমাজ প্রাণ নিতে চায় নাই। তথাপি বুদ্ধের নির্ভীকতা সামান্য নহে।

বুদ্ধের সময়ে বেদের প্রভাব অপ্রতিহত। ঈশ্বরকে অমান্য করিলেও সমাজের কাছে যে কেহ নিস্তার পাইত, কিন্তু বেদকে মান্য না করিলে তাহার অব্যাহতি ছিল না। মহর্ষি কপিল, 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ', ঈশ্বরের অস্তিত্বে প্রমাণাভাব, একথা বলিয়াও কেবল বেদকে প্রমাণ-রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই লোকমান্য হইয়াছেন। তাঁহার দর্শন আস্তিকদর্শনের মধ্যে পরিগণিত হইয়া সমাজে সমাদৃত। এ অবস্থায় বুদ্ধ যে বেদকে অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার অসাধারণ সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। জয়দেব কবি গাহিয়াছেন,—

"নিন্দসি যজ্ঞবিধে রহহ শ্রুতিজাতম্।
সদয়হৃদয়দর্শিতপশুঘাতম্ ॥"

হে অমিতাভ! তুমি সদয়হৃদয়ে পশুবলির দোষ দেখাইয়া দিয়া যজ্ঞবিধানাত্মক শ্রুতিসমূহের নিন্দা করিয়াছ। সেই সময়ে বেদনিন্দা নিঃসন্দেহ অসামান্য সাহসের পরিচায়ক।

লুথারের ন্যায়, চৈতন্য নিগ্রহ ভোগ করেন নাই সত্য, কিন্তু চৈতন্যের সাহস বাস্তবিক দুর্ল্লভ। যে হাড়ি-ডোম-চণ্ডালের ছায়া-স্পর্শে উচ্চবর্ণের হিন্দুর পাপস্পর্শ হয়, আভিজাত্য নষ্ট হয়, তাহা-দিগকে নিমাইপণ্ডিত ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও প্রেমালিঙ্গন দিয়া, এক সঙ্গে আহার-বিহার করিয়া আপ্যায়িত করিতেন। এই প্রকারে যিনি দৃঢ়মূল আভিজাত্যের মস্তকে কুঠারাঘাত করিয়াছেন, তাঁহার সাহসের বল কত! ঈদৃশ মহাপুরুষগণ লোকমঙ্গলার্থ যে অলোকসামান্য বীরত্ব ও ধীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার তুলনায় দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর প্রভৃতি যোদ্ধৃগণের স্বার্থ-প্রণোদিত, নরশোণিত-লোলুপ, ক্ষুধিত অতৃপ্ত শূরত্ব অকিঞ্চিৎকর।

বঙ্গীয়কাব্যে যে নূতন ভাব, ভাষা ও ছন্দ মাইকেল কবি আনিয়াছেন, তাহাতে কবির আত্মশক্তিতে বিশ্বাস সহকৃত-সাহসেরই নিদর্শন পাওয়া যায়।

ক্লাইব-চরিত্রের প্রধান উপকরণ আবাল্য অদম্য সাহস। দরিদ্র কৃষকবালক গারফিল্ড যৌবনে যে জয়শ্রীমণ্ডিত হইয়া মার্কিন যুক্তরাজ্যের সর্ব্বোচ্চপদে অধিরোহণ করিয়াছিলেন, তাহার প্রধান কারণ অক্লান্ত অধ্যবসায় ও সাহস।

এই প্রকারে আমরা দেখিতে পাই যে, প্রত্যেক দেশে যুগে যুগে সাহসীরাই যুগপ্রবর্ত্তক, ভীরুরা নহে। বস্তুতঃ সাহসের নিকট মানব-সভ্যতা বহু পরিমাণে ঋণী।

পূর্ব্বে যে সকল মনস্বীর কথা বলা হইয়াছে, তাঁহাদের মত প্রতিভা সকলের নাই, সেই প্রকার বীরত্ব প্রকাশের সুযোগ সকলের ঘটে না সত্য, কিন্তু সকলেই দৈনিক কার্য্যে, লোক-ব্যবহারে, কারবারে, নিজ নিজ পরিবারে সৎসাহস দেখাইতে পারেন। আমরা হয়ত জানি ইহা ভাল, উহা মন্দ; কিন্তু ভালকে গ্রহণ করিতে ও মন্দকে ত্যাগ করিতে সাহস পাই না। কর্ত্তব্য কি হয়ত তাহা বুঝি, কিন্তু করিবার সাহস নাই। সত্য বলিতে ইচ্ছা আছে, কিন্তু ভয় আসিয়া বাধা দেয়। ভয়ে ভয়ে কর্ত্তব্যের স্থলে অকর্ত্তব্য করি, সত্যের পরিবর্ত্তে মিথ্যা বলি। এই প্রকারে পৃথিবীর অনেক পাপ ভীরুতা প্রসব করিয়া থাকে। চোরের ন্যায় ভীরুর কার্য্য গোপনে, আঁধারে। কারণ, সর্ব্বদাই ভীরুর নিঠুর 'হিয়া কাঁপে দুরু দুরু'। ঘরের বাহির হইয়া কাজ করিতে হইলেই তাহার প্রাণ কাঁপিয়া ওঠে। সাহসীর কার্য্য স্পষ্ট দিবালোকে, প্রকাশ্যে। তাহার বুক সাতশ বুরুল পুরু। ভীরুতা—

অন্ধকূপগর্ভস্থ শৈবাল; সাহস—মানস-সরোবরের প্রফুল্লকমল। ভীরুতা—শকুনির কপট পাশা; সাহস—অর্জ্জুনের জয়শীল গাণ্ডীব। ভীরুতা—মলিনশয্যার মৎকুণ; সাহস—মহারণ্যের মহাসিংহ।

দুর্ব্বল সমাজ সকল প্রকার দুর্ব্বলতাকে সযত্নে পোষণ করে, এবং কর্ত্তব্যের পথে কৃত্রিম বাধা জন্মাইয়া থাকে; অধর্ম্মকে ধর্ম্মের পোষাকে সাজাইয়া গৌরব প্রকাশ করে। এ হেন সমাজে অশাস্ত্র, শাস্ত্রের স্থান অধিকার করিয়া বসে।

সমাজের ছদ্মবেশী পাপ সকল দূর করিতে বহুবল ও সৎসাহসের প্রয়োজন। শুভ, মহৎ অনুষ্ঠানে দুর্ব্বল সমাজ কেবল উপেক্ষা নয়, নানা প্রকার দুর্ব্বল শাসন-ভয় দেখাইয়া বিঘ্ন জন্মায়। তাহা পায়ে ঠেলিয়া অগ্রসর হইতে নির্ভীকতার প্রয়োজন।

যাহার অধ্যবসায় নাই, সাহস নাই, যে অলস দৈবপর, তাহার কাছে লক্ষ্মী আসেন না, সে লক্ষ্মীছাড়া। এ কথা হিতোপদেশকার বলিয়াছেন। ইংলণ্ডের ম্যাকে সাহেবের কবিতায় ইহারই দীর্ঘ প্রতি-ধ্বনি শুনা যায়।

"If thou canst plan a noble deed,
And never flag till it succeed,
Though in the strife thy heart should bleed,
Whatever obstacles control,
Thine hour will come,—go on, true soul!
Thou'lt win the prize, thou'lt reach the goal."

যদি কোন মহান্ উদার সঙ্কল্প লইয়া আফলোদয় কর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর থাক, কখনও পশ্চাৎপদ না হও, যে কোন বাধাবিপত্তিই

উপস্থিত হউক না কেন, হৃদয়ের শোণিতপাত করিয়াও যদি সেই বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিতে পার, তবে নিশ্চয়ই তোমার সুসময় আসিবে। অতএব বলিতেছি, একচিত্ত, একনিষ্ঠ হইয়া, সাহসে ভর করিয়া আরব্ধ কর্ম্ম করিতে থাক, কার্য্যসিদ্ধি হইবে।

ভীরু কিন্তু এসব কথায়, সাহসের কথায় একেবারে বধির।

ভীরু বাঙালী বলিয়া আমাদের একটা চিরদিনের কলঙ্ক আছে। অন্যে যদি আমাদিগকে ভীরু বলে, তবে আমরা গালি মনে করি। "আপ্‌না কথা আপ্‌নে কই, পরে কৈলে বেজার হই" নিজের দোষ অন্যে বলিলে রাগ হইতে পারে, কিন্তু নিজের দোষ নিজে দেখিলে, নিজ দোষের কথা নিজে বলিলে, উপকার দর্শিতে পারে।

ভীরুতা কর্ত্তব্যের মহা কণ্টক, মনের মহাব্যাধি, মনুষ্যত্বের মূর্ত্তিমান্ বিঘ্ন। ভীরু, মানুষের মধ্যেই গণ্য নয়। অন্যান্য অনেক গুণ থাকিলেও একমাত্র সৎসাহসের অভাবে মানুষ, মনুষ্যত্বহীন হইয়া পড়ে। আমরা যদি মানুষ হইতে চাই, তবে এই কণ্টক দূর করিতে হইবে, এই মহাব্যাধির প্রতীকার করিতে হইবে। কিন্তু কোনও ঔষধ আছে কি? রোগ মাত্রেরই ঔষধ আছে, চিকিৎসা আছে। ভীরুতা-রোগ দুঃসাধ্য হইলেও অসাধ্য নহে। প্রতীকারের কথা পূর্ব্বেই একপ্রকার বলা হইয়াছে; এখন সংক্ষেপে আরও দুই একটী কথা বলিতেছি। আগে বুঝিতে হইবে, আমরা ভীরু কি না। ভীরু নই, একথা বলিলে আত্মবঞ্চনা করা হইবে। বুঝিয়া, ভীরুতা দূর করিবার ইচ্ছা জন্মাইতে হইবে। ইচ্ছার অসাধ্য কোন কর্ম্ম নাই। বলের অভাবে, বিনা কারণেও মনে ভয় আসে। শরীরের ও মনের বলবৃদ্ধি হইলে ভীরুতা আপ্‌না হইতেই চলিয়া যাইবে। বলের জন্য গৃহী

মাত্রেরই সংযম শিক্ষা করা ও সন্তানদিগকে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

কি শিখিব?

শিখিব আমরা ভয়কে জয় করিতে। শিখিব আমরা সাহসকে জীবনরথের সারথি করিতে।

আত্মসংযম।

"আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ।"—গীতা।

মানুষ নিজেই নিজের বন্ধু, নিজেই নিজের শত্রু।

শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া মানুষের একটা গর্ব্ব ও গৌরব আছে। বাস্তবিক পশুধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া পশু হইতে বিশেষত্ব লাভ করিতে পারিলেই মানুষ, মানুষ বলিয়া গৌরব করিবার অধিকারী হয়। পশুধর্ম্ম কেবল প্রবৃত্তিমূলক। ইহা অবিবেকপূর্ব্বক প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির দাসত্ব। এই দাসত্ব পরিহারে মানবের প্রকৃত গৌরব। মানবধর্ম্ম প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-মূলক। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এই দুই লইয়াই মানবধর্ম্ম। কেবল-ভোগে পশু। ভোগে ও ত্যাগে মানুষ। কেবল-ত্যাগে দেবতা। ভীষ্মের জীবন কেবল-ত্যাগের জীবন। তিনি দেবতা। সংসারের পূর্ণকোলাহলের মধ্যে থাকিয়াও তিনি ভোগে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। তিনি যেমন দিগ্বিজয়ী, তেমনি ইন্দ্রিয়জয়ী মহাবীর। রিপুজয়ী ও জিতেন্দ্রিয় শব্দ তাঁহাতে সম্পূর্ণ সার্থক। কাম বা ক্রোধ, লোভ বা মোহ, মদ বা মাৎসর্য্য—কোন একটা রিপুও তাঁহার পবিত্র হৃদয়-মন্দির স্পর্শ করিতে কোন দিনও সাহস পায় নাই। তাঁহার বীর্য্য-হুঙ্কারে রিপু ছয়টা ভয় পাইয়াই বুঝি কোথায় লুকাইয়াছিল!

আমরা দেবতা হইতে না পারিলেও মানুষ হইতে পারি। মানুষ হইলেও মনুষ্য-জন্ম সার্থক।

প্রত্যেক মানবাত্মা নিজ নিজ অন্তর-রাজ্যের রাজা। যে রাজা, 'রূপকথা'য় বর্ণিত রাজার ন্যায় 'দুয়োরাণী' ও 'সুয়োরাণী' (সুপ্রবৃত্তি ও কুপ্রবৃত্তি) লইয়া ঘর করেন, এবং দুয়োরাণীকে নিগ্রহ করিয়া সুয়োরাণীর বশীভূত হন, তিনি 'রূপকথা'র রাজার ন্যায় শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হন।

বৃত্রাসুর মূর্ত্তিমান্ দম্ভ। বৃত্রাসুরের পত্নী ঐন্দ্রিলা মূর্ত্তিমতী কুপ্রবৃত্তি। ঐন্দ্রিলা পতির বাসনানলে কেবলই ইন্ধন যোগাইত। ঐন্দ্রিলার উত্তেজনায় দেবদ্রোহী বৃত্র ইন্দ্রাণীকে হরণ করিয়াছিল। কেবল-প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী, অবশী বৃত্র পাপে ডুবিয়া প্রাণ হারাইয়াছিল।

মানুষের অন্তরে অসুর আছে, দেবতা আছেন। এই অসুরকে যিনি জয় করিতে পারিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত বীর। তিনিই দেবতার সেবা কবিয়া দেবত্বলাভে সমর্থ। সাধারণতঃ মানুষের অসংযত আত্মা 'সুয়োরাণী'র (কুপ্রবৃত্তির) কুহকে ভুলিয়া তাহাকেই ভালবাসে, তাহারই কথা শুনে, এবং 'দুয়োরাণী'কে (সুপ্রবৃত্তিকে) অনাদর করে।

বৃত্রাসুর প্রভৃতির কথা কল্পনার সৃষ্টি বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি ; কিন্তু কুপ্রবৃত্তি লইয়া মানুষ অসুর হয় একথা সত্য ; ইতিহাস তার সাক্ষী।

মাতৃহন্তা, স্ত্রীহন্তা, গুরুহন্তা, অসংখ্য নরহন্তা রোমসম্রাট্ নিরোর (Nero) কুকীর্ত্তি ইতিহাসের কলঙ্কিত পৃষ্ঠা অদ্যাপি ঘোষণা করিতেছে। অদ্যাপি লোকে তাহার নামে শত ধিক্কার দিতেছে। দুরন্তবন্যশার্দ্দূলও বোধ হয় মাতৃহত্যা করিতে কুণ্ঠিত হয়, যে বাঘিনীর সহিত

সে পত্নীবৎ ব্যবহার করে, তাহাকে হত্যা করিতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া নিরো ক্রমে মাতাকে, ভার্য্যাকে, শিক্ষক-মহাশয়কে বধ করিয়াছেন, কত কত নিরপরাধ ব্যক্তির প্রাণদণ্ড করিয়াছেন। মানুষ হিংস্র ব্যাঘ্র অপেক্ষাও হিংস্র হইতে পারে না কি? অসুর অপেক্ষাও অসুর হইতে পারে না কি?

একদা নিরোর ইচ্ছা হইল—অগ্নিদাহে ঘরবাড়ী কেমন জ্বলিতে থাকে, জ্বলন্ত অগ্নিশিখার কিরূপ শোভা হয়, নগরে আগুন লাগাইয়া দেখিব। যেই ইচ্ছা, সেই কার্য্য। আগুন জ্বালাইয়া নগর দগ্ধ করিবার হুকুম দিয়া সম্রাট্ তামাসা দেখিবার জন্য উচ্চ প্রাসাদ-শিখরে আরোহণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে নগরের অনেক ঘর-বাড়ী ভস্মসাৎ হইল। এই অগ্নিকাণ্ডে নগরবাসিগণের কি দুরবস্থা ঘটিয়াছিল, তাহা স্মরণেও লোমহর্ষণ হয়! ইহাতে কেবল নাগরিক-দিগের নয়, নিজেরও প্রভূত ক্ষতি হইয়াছিল। এইরূপ নৃশংসকার্য্য করিয়া সম্রাট্ নিজের মৃত্যু নিজে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন।

সম্রাটের এই বৃহৎ কু-ইচ্ছা সাধারণ লোকের হৃদয়ে জাগিয়া এই প্রকার বৃহৎ কুকার্য্য সাধন করিতে সম্ভবতঃ পারে না, কিন্তু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুবাসনা লইয়া কত অসংযমী যুবক কুপথে চলিয়া নিজের সর্ব্বনাশ-সাধন করে। কত সোণার সংসার এই প্রকার অসংযমাগ্নিতে পুড়িয়া ছারখার হয়। কত লোক সামান্য একটু কর্ত্তৃত্ব-প্রভুত্ব পাইয়াই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিরো হইয়া বসে। ইতিহাসে ইহাদের নামগন্ধ না থাকিলেও ইহাদের দুর্গন্ধময় চরিত্রে সমাজ অপবিত্র হইয়া থাকে। এই অসুরত্ব বা পশুত্ব দূর করিবার জন্য সংযম-শিক্ষার প্রয়োজন।

নির্ম্মল-সরল বলিয়াই শিশুর মন স্বর্গীয় আনন্দে পরিপূর্ণ। শিশু

ভগবানের প্রিয়। তাহার হৃদয় ভগবানের মন্দির। 'Heaven is about us in our infancy'. শিশুর গাত্রে ধূলি-কাদা থাকিলেও তাহার 'সাদা মনে কাদা নাই'। কিন্তু 'বয়স বাড়ে আর দোষ বাড়ে'। যতই বয়স বাড়িতে থাকে, পৃথিবীর সঙ্গে যতই ঘনিষ্ঠতা জন্মিতে থাকে, ততই মনে ময়লা ও বিকার জন্মে। মলে ঘৃণিত কৃমি-কীটের জন্ম হয়। মলিন, অপবিত্র মনের মধ্যে ভূত পিশাচ, রাক্ষসেরা আসিয়া বাস করে। কুভাষ-কুচিন্তা সকল সর্ব্বদা কিলিবিলি করিতে থাকে, দেবমন্দিরকে সয়তানের মন্দির করে, স্বর্গকে নরক করিয়া তোলে।

আজকাল এই দেশে ভদ্র হওয়ার একটা সাড়া পড়িয়াছে। ছোট, বড় সকলেই ভদ্রবেশ লইয়া ভদ্র বলিয়া পরিচয় দিতে চায়। কিন্তু মনকে ভদ্রলোক করিতে না পারিলে, কেহই ভদ্র হইতে পারে না। সাদা ধব্-ধবে, সুন্দর পোষাকের নীচে, সুগন্ধ-মাখা, মার্জ্জিত দেহের ভিতরে কালকূটে ভরা কাল মন থাকিতে পারে। কাল, অভদ্র মন লইয়া ভদ্রসমাজে বাহির হওয়া নিতান্ত লজ্জার কথা। মন ভদ্রলোক হইলে, তখন আর সে অভদ্রসমাজে থাকিতে চায় না, তখন সে ইন্দ্রিয়গুলিকেও ভদ্র করিয়া লয়। তাহার সমস্ত পরিবার ভদ্র হইতে থাকে।

তখন সে চায় কেবল ভদ্রকথা শুনিতে, ভদ্রবস্তু দেখিতে।

'ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম ভদ্রং পশ্যেম অক্ষভির্যজত্রাঃ'।

বিনা শিক্ষায় মনকে ভদ্রলোক করা কঠিন, সুতরাং বাল্যকাল হইতে সংযম অভ্যাস করা আবশ্যক, যেন মনে কোন ময়লা জন্মিতে না পারে।

সংযম অর্থ ইন্দ্রিয়ের নিরোধ, সংহার নহে। কু-ইচ্ছার দমন, ইচ্ছাবৃত্তির উচ্ছেদন নহে।

"প্রত্যাহার-বড়িশেন ইচ্ছা-মৎসীং নিযচ্ছত।"

প্রত্যাহার-বড়িশের দ্বারা ইচ্ছা-মৎসীকে ধর, আটকাইয়া রাখ। অন্যায়রূপে ভোগলালসা চরিতার্থ করিতে যে কোন ইন্দ্রিয় যখনই ধাবিত হইবে, তখনই তাহাকে খপ্ করিয়া ধরিবে এবং ভিতরের দিকে টানিয়া লইবে। কচ্ছপ যেমন শুঁড়, হাত পা বাহির করে, আবার গুটাইয়া ভিতরে লইয়া যায়, সেইরূপ বহির্মুখ ইন্দ্রিয়গুলিকে অন্তর্মুখীন করিতে হইবে। বাহ্যবস্তুভোগের জন্য ইন্দ্রিয়সকল বাহিরে ছুটিয়া বেড়ায়। মন ইহাদের সহায়, সর্দ্দার। কু-ইচ্ছা লইয়া মন যখন ইহাদিগকে কুপথে চালায়, তখন বিবেকের বেত্রাঘাত করিয়া মনকে ফিরাইতে হয়।

যৌবনে, মনে বিকার জন্মে, যৌবন বিষমকাল। যৌবনে বল আসে, যৌবন সুন্দর, যদি মনকে সুন্দর-পবিত্র রাখা যায়। এই সময় ইন্দ্রিয় ও মন স্বভাবতঃ সতেজ ও বলশালী হয়। ইহাদিগকে বশে রাখিয়া সর্ব্বদা কর্ত্তব্যসাধনই সংযমের উদ্দেশ্য। দ্রুতগামী, তেজস্বী অশ্ববরের পৃষ্ঠারোহণে বলবান্ শিক্ষিত আরোহীর যেমন আনন্দ ও স্ফূর্ত্তি, তেম্‌নি গন্তব্য স্থানে সত্বরে উপস্থিতি। দুর্ব্বল, অর্দ্ধমৃত গর্দ্দভতুল্য অশ্বচালন বিরক্তিজনক, বিড়ম্বনামাত্র। সেইরূপ বলিষ্ঠ ইন্দ্রিয় ও মন লইয়া, উহাদিগকে স্ববশে আনিয়া যেমন সুখে গুরুকার্য্য সম্পাদন করিতে পারা যায়, বলহীন ইন্দ্রিয় ও মনের দ্বারা তেমন পারা যায় না। আমরা দুর্ব্বল জাতি, দুর্ব্বল আমাদের ইন্দ্রিয়, দুর্ব্বল আমাদের মন। দুর্ব্বল বলিয়াই ইহাদিগকে বশে রাখা বড় কঠিন। দুর্ব্বল দেহ অচল হইলেও দুর্ব্বল মন সতত চঞ্চল, দুর্ব্বল ইন্দ্রিয় সতত বিপথগামী। ইহাদিগকে কেবলই টানিয়া লইতে হয়। ইহারা

গাধার মতন চাবুকের শত আঘাতেও চলিতে চায় না, বসিয়া পড়ে। কিন্তু তেজী টাট্টু ঘোড়ার এক চাবুকই যথেষ্ট। বলবানের পক্ষে সংযম শিক্ষা তত কঠিন নহে।

মানুষের অন্তর-রাজ্যমধ্যে কামক্রোধাদি রিপুসকল সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে। কামের এক নাম মনসিজ বা মনোজ। কাম মনেই জন্মে, মনের মধ্যেই থাকে। ক্রোধলোভাদি কামের সঙ্গী। ইহাদের মত দুর্জ্জয় শত্রু আর নাই। কিন্তু দুর্গ জয় করিতে পারিলেই দুর্গবাসিগণ বশে আসে, না-হয় পলাইয়া প্রস্থান করে। মনের দ্বারাই ইন্দ্রিয় জয়, মনের দ্বারাই মনের জয় করিতে হয়।

সাধারণতঃ লোকে পরের উপর আধিপত্য করিতে একান্ত সমুৎসুক; কিন্তু নিজের উপর প্রভুত্ব লাভ করিতে পারিলেই প্রকৃত সুখ। নিজের উপর যাহার প্রভুত্ব নাই, যে রিপুর দাস, তাহার স্বাধীনতা কোথায়? আত্মজয়ে প্রকৃত স্বাধীনতা। পরিবারমধ্যে যদি সকলেই স্ব স্ব প্রধান হইয়া কর্ত্তার অবাধ্য হয় ও কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব লোপ করে, তবে সেখানে কেবল বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি। পক্ষান্তরে, কর্ত্তা যদি উহাদিগকে শাসনে-অধীনে রাখিতে পারেন, তবে সুখশান্তি সম্ভবপর। সেইরূপ অন্তর-পরিবারে সকলকে বশীভূত রাখিতে পারিলেই আত্মা সুস্থ-সুখী হইতে পারে।

সংযম চারিত্র্যলাভের প্রধান সাধন। ইহার বলে মানুষ পশুর উপরে আসন পাইয়া থাকে। এই সংসার পরীক্ষা-প্রলোভনে, বিঘ্ন-বিপদে পরিপূর্ণ। সংযম-অভাবে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া দুষ্কর, বিপদে আত্মরক্ষা করা দুঃসাধ্য। সংযমবিহীন নর জীবনস্রোতে তৃণবৎ ভাসিতে থাকে, কূল পায় না। অসংযমে অমিতাচার,

অত্যাচার, স্বেচ্ছাচার। বিবেকাধীন থাকিয়া নিয়মপূর্ব্বক যথেচ্ছ প্রবৃত্তির শাসন-সংযম না হইলে জীবন উচ্ছৃঙ্খল ও দুঃখময় হইয়া থাকে।

সংযমের উপকারিতা উত্তমরূপে জানিয়াও অভ্যাসদোষে অনেক যুবককে ইন্দ্রিয়সংযমে সম্পূর্ণ অসমর্থ দেখা যায়। কবি বর্ণস্ স্বয়ং লিখিয়াছেন :—

Reader ! attend, whether thy soul
Soars fancy's flight beyond the pole,
Or darkling grubs the earthly hole
In low pursuit ;
Know—prudent, cautious self-control
Is wisdom's root.

পাঠক ! প্রণিধান করুন, আপনার আত্মা কল্পনাবলে মেরু অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধেই উঠুক অথবা সামান্য কার্য্যের লাগিয়া আঁধারে থাকিয়া মাটীর নীচে গর্ত্তই খনন করুক, ইহা জানিবেন যে, সুবিবেচিত, সতর্ক আত্মসংযমই বিজ্ঞতার মূল।

কি সুন্দর উপদেশ ! কিন্তু উপদেষ্টা স্বয়ং সংযমের কোন ধার ধারিতেন না। তিনি অত্যন্ত সুরাসক্ত ছিলেন, পানলোভ সম্বরণ করিবার সামর্থ্য তাঁহার আদৌ ছিল না। *

---

* No one knew the value of self-control better than the poet Burns, and no one could teach it more eloquently to others ; but when it came to practice, Burns was as weak as the weakest. One of the vices before which Burns fell and it must be said to be a master-vice, because it is productive of so many other vices—was drinking.

Smile's Character.

কত লোক পরকে এই প্রকার উপদেশ দিয়া থাকেন, কিন্তু নিজে পালন করিতে পারেন না।

"পরোপদেশে পাণ্ডিত্যং সর্ব্বেষাং সুকরং নৃণাম্।
ধর্ম্মে স্বীয়মনুষ্ঠানং কস্যচিৎ তু মহাত্মনঃ॥"

পরকে উপদেশ দিতে সকলেই পণ্ডিত। কিন্তু সেই উপদেশ-অনুসারে কার্য্য করিতে অনেকেই পারেন না। যিনি পারেন, তিনি মহাত্মা।

জাট্‌ফেনের যুদ্ধে সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া সার ফিলিপ সিদ্‌নি (Sir Philip Sidney) দারুণ জল-পিপাসায় কাতর হইয়াছিলেন, কিন্তু জলের অত্যন্ত অভাব। অতি কষ্টে একটু জল আনিয়া তাঁহাকে দেওয়া হইল। তিনি তাহা পান করিবার জন্য মুখের কাছে নিয়াছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, তদবস্থ একজন সামান্য সৈনিক সেই জলের গ্লাসের পানে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া রহিয়াছে। ফিলিপ তৎক্ষণাৎ নিজে পান না করিয়া সৈনিককে পানার্থ সেই জল দিলেন। কেমন সংযম! কেমন ত্যাগস্বীকার! কবি বর্ণস্ ও ইঁহার কার্য্যে কত পার্থক্য! কেবল এই একটী মাত্র কার্য্য স্মরণ করিয়াই আমরা বলিতে পারি, ইঁহার 'সার'-উপাধি সম্পূর্ণ সার্থক। ইনি প্রকৃতই মহাশয় ব্যক্তি।

বঙ্গের অসামান্য প্রতিভাশালী কবি মধুসূদনের কি শোচনীয় পরিণাম ঘটিয়াছিল, তাহা ভাবিতে বুক ফাটিয়া যায়! ধনীর পুত্র হইয়া, বাগ্দেবীর বরপুত্র হইয়া, বহুভাষাবিৎ ব্যারিষ্টার হইয়া, কেন তাঁহার এত অর্থাভাব? কেন তিনি অর্থাভাবে নিদারুণ মনঃকষ্টে

দাতব্য চিকিৎসালয়ে অকালে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন? সংযমের অভাবই ইহার একমাত্র কারণ। মধুসূদনের জীবন অবশ্য বিদ্বান্‌দিগের পক্ষে বিশেষ শিক্ষাপ্রদ।

শরীর ও চরিত্রগঠন শাসন-শিক্ষণ-সাপেক্ষ। শরীরকে গড়িয়া পিটিয়া লোহার ভীম করা যায়, আবার ননীর পুতুলও করা যায়। আমরা কিন্তু ননীর পুতুলই ভালবাসি। একটু সূর্য্যতাপেই ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েগুলি কেমন গলিয়া যায়! ছোটবেলা হইতে, রৌদ্র বাত-বৃষ্টি হইতে সন্তানদিগকে রক্ষা করিতে ভদ্রঘরের পিতামাতা সর্ব্বদা এত সতর্কতা অবলম্বন করেন যে, যদি দৈবাৎ সামান্য একটু রৌদ্র বা বৃষ্টির জল গায়ে লাগে, তবেই তাহাদের মাথা ধরে, জ্বর হয়, বা অন্য কোন রকম অসুখ হইয়া পড়ে। এই অভ্যাসের ফলে তাহারা বড় হইয়াও বড় ননীর পুতুলই হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে আমরা অহরহ দেখিতেছি, শ্রাবণের ধারা কৃষকের অনাবৃত মস্তকে অবিশ্রান্ত পতিত হইয়াও মাথা ধরা জন্মাইতে পারে না। সে অনায়াসে পৌষের শীত, চৈত্রের রৌদ্র সহ্য করিয়া শরীরটাকে দৃঢ় করিয়া তুলিয়াছে। ইহা আবাল্য অভ্যাসের ফল। মুটে মজুর তিন মণী বস্তা বহন করিয়া পৃষ্ঠের শক্তি পরীক্ষা করে। নগ্নপদে প্রস্তর-ইষ্টক-নির্ম্মিত রাজপথে যোজন পথ হাঁটিতে অথবা দিনে ২৫।৩০ মাইল চলিতে কেহ ক্লেশ বোধ করে না। কেহ বা পোয়া মাইল হাঁটিয়া ক্লান্ত হয়। কেহ দশ মণ পাথর বুকে লইতে পারে, কেহ পাঁচ সের পাথরের চাপ সহিতে পারে না। ইহা অভ্যাসের ফল। ফলতঃ "শরীরের নাম মহাশয়, যা সহাও তাই সয়।"

ননীর পুতুলে কোন কাজ হয় না। লোহার শরীর চাই। লোহা

যেমন কাজের জিনিষ, এমন কোন ধাতুই নহে। সেইরূপ লোহার শরীরদ্বারা জীবনে অনেক কাজ পাওয়া যায়। লোহার শরীর পাইতে হইলে, শরীরকে না বসাইয়া প্রতিদিন নিয়মিতরূপে খাটাইতে হইবে। ধনী, বাবু, ভদ্র সকলেরই শ্রম-ব্যায়াম, প্রকৃতির সঙ্গে খেলা, উদ্যম-সাপেক্ষ ক্রীড়া অভ্যাস করিতে হইবে।

আমরা বলিয়াছি, শরীরকে গড়িয়া লোহার ভীম করা যায়। ইহা যে কথার কথা নয়, ইহা যে বস্তুগত্যা সত্য, তাহা ঢাকার শ্যামাকান্ত এবং মাদ্রাজের রামমূর্ত্তি প্রমাণ করিয়াছেন।

শ্যামাকান্ত নিজের সার্কাসে বড় বড় বাঘের সহিত খেলা করিয়া, বার তের মণ পাথর বুকে লইয়া, শারীরিক শক্তির যেরূপ পরীক্ষা দিয়াছেন, তাহা আমরা অনেকেই দেখিয়াছি।

রামমূর্ত্তি যদিও বাল্যকালে হাঁপানিরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং অতিশয় দুর্ব্বল ছিলেন, তথাপি প্রবল ইচ্ছা লইয়া, রীতিমত নানাপ্রকার ব্যায়াম শিক্ষা করিয়া, ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে তিনি অসামান্য শারীরিক শক্তি লাভ করিয়াছেন। কয়েক বৎসর হইল, তিনি কলিকাতায় গড়ের মাঠে যে চলন্ত-মোটর গাড়ীর গতিরোধ করিয়াছিলেন, তাঁহার বুকের উপর দিয়া যে প্রকাণ্ড হাতী চলিয়া গিয়াছিল, তাহা দেখিয়া অনেকেই বিস্মিত হইয়াছেন।

শ্যামাকান্ত বা রামমূর্ত্তির পক্ষে যাহা সম্ভব হইয়াছে, তাহা যদু-মধু-বিধুর পক্ষে কেন অসম্ভব হইবে?

শরীরের পক্ষে বাহ্যিক ড্রিল (Drill) যেমন, আত্মজয় সম্বন্ধেও তেম্‌নি আভ্যন্তরীণ ড্রিল, মনের ড্রিল হিতকারী। শরীরকে মহাশয় করিয়া মনকে মহাশয় করিতে পারিলেই মানুষ মহাশয়

হইতে পারে। শৈলগাত্রের ন্যায় রৌদ্র, বাত, বৃষ্টি সহিয়া শরীর—মহাশয়। স্তুতি-নিন্দা, সুখ-দুঃখ সহিয়া মন, মহাশয় হয়। নিজের প্রশংসায়, সুখসম্পদের অবস্থায়, যাহার মন উৎক্ষিপ্ত তুলার মত দশ হাত উর্দ্ধে, আকাশে উড়িয়া বেড়ায় না, আর নিন্দাবাদে, দুঃখবিপদে যাহার মন নিক্ষিপ্ত প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় দশ হাত জলের তলে ডুবিয়া যায় না, তিনিই মহাশয়।

আমরা লোহার শরীর লইয়া সোনার মন গড়িতে চাই। সোনার মন লইয়া সোনার মানুষ, খাঁটি সোনার মানুষ হইতে চাই। আমরা শরীরে অসুরের বল লইয়া দেবতার মত প্রয়োগ করিতে শিখিব। সেক্ষপির বলিয়াছেন :—

O! it is excellent
To have a giant's strength ; but it is tyrannous
To use it like a giant. (Measure for Measure.)

দৈত্যের বল লাভ করা অতি উত্তম, কিন্তু দৈত্যের মত বল প্রয়োগ করা নৃশংসতা।

যিনি আত্মজয়ী, জিতেন্দ্রিয়, তিনি বিশ্বমানববিজয়ী, প্রকৃত বীর-পুরুষ। লোকের হৃদয় তিনি যেমন জয় করিতে পারেন, কোন দিগ্বিজয়ী সৈনিকপুরুষ তেমন পারেন না। দেশজয় অপেক্ষা কাম-ক্রোধ জয় শতগুণে কঠিন, সুতরাং শতগুণে প্রশংসনীয়। মন ও ইন্দ্রিয়ের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য করা, কামক্রোধাদি ষড়্‌রিপুর বশী-ভূত না হইয়া ইহাদিগকে বশে রাখাই আত্মজয়। অসংযত, অবাধ্য মন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গুলিকে লইয়া আত্মদ্রোহী। এই বিদ্রোহ দমন ও

ইহাদের সমুচিত শাসনের নাম আত্মশাসন। আত্মশাসনই প্রকৃত স্বায়ত্তশাসন। এ কার্য্যে বিদ্রোহীদিগের প্রতি সর্ব্বদা শ্যেনদৃষ্টি রাখা চাই। কোন সময়েও ইহাদিগকে প্রশ্রয় দিতে নাই। যিনি প্রশ্রয় দেন, তিনি নিজেই নিজের শত্রু। যিনি শাসন করেন, তিনি নিজেই নিজের বন্ধু।

কাম-বশে বা ক্রোধের উত্তেজনায় লোকে আত্মহত্যা করে, মানুষ খুন করে, নিজের ও পরের ধর্ম্মনাশ ও সর্ব্বনাশ করে। লোভের বশে লোক চুরি করে, ফাটক খাটে। জিহ্বাকে শাসন করিতে না পারিয়া কতলোক কুখাদ্য খাইয়া পেটের অসুখে কত কষ্ট পায়। শুনিয়াছি, ঢাকার কোন ছাত্রনিবাসে এক ছাত্র আহারের পর অপরিমিত মিঠাই খাইয়া বিসূচিকারোগে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

কামাদি ষড়্‌বর্গ আমাদের পরম শত্রু। তন্মধ্যে কাম সর্ব্বপ্রধান। কাম প্রধান মল্ল। ইহাকে পরাস্ত করিতে পারিলেই তার দলের আর সকল আপনা হইতেই পৃষ্ঠভঙ্গ দিবে। কাম চরিতার্থ হইতে বাধা পাইলেই ক্রোধের উৎপত্তি হয়। লোভ, মোহ, মদ অজ্ঞানমূলক। এই রিপুগণ আমাদিগকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাপের পথে লইয়া যায়।

ভগবৎপ্রেমের উজ্জ্বল কিরণপাতে, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায়, পাপ কাম কোথায় চলিয়া যায়।

কামের সঙ্গে সঙ্গে ক্রোধ ও লোভ অন্তর্হিত হয়। তেজস্বীরা ক্রোধ পরিহার করেন, কিন্তু তেজ পরিত্যাগ করেন না। ক্রোধ আর তেজ ভিন্ন পদার্থ। তেজ—বল। ক্রোধ—দুর্ব্বলতা।

তেজস্বীতি যমাহুর্ব্বৈ পণ্ডিতা দীর্ঘদর্শিনঃ।
ন ক্রোধোঽভ্যন্তরস্তস্য ভবতীতি বিনিশ্চিতম্॥ মহাভারত।

দীর্ঘদর্শী পণ্ডিতেরা যাঁহাকে তেজস্বী বলিয়া থাকেন, তাঁহার অন্তরে ক্রোধ নাই ; ইহা সুনিশ্চিত।

মাৎসর্য্য প্রেমাভাবনিবন্ধন। মানবপ্রেম জন্মিলে মাৎসর্য্য আসিয়া মনকে পরশ্রীকাতর করিতে পারে না।

আত্মজ্ঞানোদয়ে মদ-মোহ থাকিতে পারে না। ভগবৎপ্রেম জন্মিলে মানবপ্রেম, জীবে দয়া আপনা হইতেই আসে।

শিক্ষা ব্যতীত সংযম সম্ভবে না, পশুত্ব ঘোচে না। তাই প্রাচীনকালের আচার্য্যগণ সপ্তমবর্ষীয় ব্রাহ্মণবালকের উপনয়নসংস্কার বিধানপূর্ব্বক শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেন।

উপনয়নকালে বালককে প্রধানতঃ তিনটী প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে হইত।

১। ব্রতঞ্চরিষ্যামি, তত্তে প্রব্রবীমি। আমি আপনার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, আমি ব্রত (ব্রহ্মচর্য্য) পালন করিব।

২। তচ্ছকেয়ং তেনর্দ্ধ্যা সমিদহমনৃতাৎ। সেই ব্রহ্মচর্য্যের বলে ঋদ্ধিমান্ হইয়া আমি অনৃত অর্থাৎ মিথ্যা হইতে উত্তীর্ণ হইব।

৩। সত্যমুপৈমি স্বাহা। আমি সত্যলাভ করিব।

পুরাকালে ছাত্রবৃন্দ, সংযমী আচার্য্যগুরুর নিকট শিক্ষা-দীক্ষা পাইয়া সংযমী, চরিত্রবান্ হইতেন।

বর্ত্তমানকালে সমাজের কল্যাণকামী, পরিণামদর্শী, বিজ্ঞ শিক্ষকগণও বোধ হয় ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া থাকেন—আমরা তোমাদিগকে সাদরে আহ্বান করিয়া বলিতেছি, তোমরা প্রত্যেকে এই প্রতিজ্ঞা তিনটী স্বর্ণাক্ষরে হৃদয়গ্রন্থে লিখিয়া রাখ এবং সর্ব্বপ্রযত্নে পালন কর। ভগবান্ তোমাদের মঙ্গল বিধান করিবেন। প্রতিজ্ঞা কর—

১। ব্রহ্মচর্য্য পালন করিব। সম্যক্‌রূপে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া প্রকৃত ধর্ম্ম ও জ্ঞান লাভ করিব।

২। মিথ্যাকে সর্ব্বথা বর্জ্জন করিব।

৩। সত্যের সেবা করিব। সত্যস্বরূপ ব্রহ্মকে লাভ করিব।

কেবল এইরূপ প্রতিজ্ঞাই যথেষ্ট নহে। ব্রহ্মচর্য্য পালনের ব্যবস্থা করা চাই। ছাত্রদিগকে পথ দেখাইয়া, সেই পথে চালাইতে পারিলেই তাহাদের চরিত্রগঠন সহজ হইবে।

কামক্রোধাদিরিপু দমন করিবার সুন্দর সুন্দর উপদেশ ও উপায় শাস্ত্রে বিস্তারিতভাবে লিখিত আছে। কিন্তু সাধুসঙ্গ লাভ অতি উত্তম উপায়। সাধুদৃষ্টান্তে রিপুদমন ও চরিত্রগঠন সহজে হয়। ছাত্রের পক্ষে দীর্ঘকাল সৎশিক্ষকের সহবাসই সাধুসঙ্গ।

সংযমী, ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর শিক্ষাধীন থাকিয়া ছাত্র কৃতার্থ হইতে পারে। সুচরিত্র বিদ্বান্‌গণ নিঃস্বার্থভাবে, পিতৃস্থানীয় হইয়া, তরলমতি বালকদিগকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়া, মানুষ করিবার ভারগ্রহণ করিলে তাহাদের মহা উপকার হইবে। প্রাচীনকালে, শিক্ষকালয় ও শিষ্যালয় এক, অভিন্ন ছিল। যিনি শিক্ষাগুরু তিনিই দীক্ষাগুরু হইতেন। কিন্তু এখন এরূপ ব্যবস্থা সম্ভবপর কি? সেকালের ব্রহ্মচর্য্যের ব্যবস্থা এ যুগে সময়োচিত হইবে কি?

ব্রহ্মচর্য্য ও বিলাসিতায় অহি-নকুল-সম্বন্ধ। এই বিলাসিতার দিনে, সভ্যতার যুগে, সেকালের ব্রহ্মচর্য্যের কথাটা সভ্যতাভিমানী যুবকদল প্রলাপবাক্য বলিয়া হয়ত উড়াইয়া দিবেন। শিল্প-বিজ্ঞানের প্রসাদে পৃথিবীময় সুখসৌখীনতার দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি, দিন দিন নিত্য-নূতন বিলাসদ্রব্যের সৃষ্টি ও আমদানি হইতেছে। ঘরে ঘরে বিলাসিতা

প্রবেশ করিয়াছে। কালের গতি রোধ করিবে কে? কেন আমরা বিলাসিতা বর্জ্জন করিয়া সুখে বঞ্চিত হইব? কেন আমরা শুক্‌ন কাঠ হইতে যাব? ব্রহ্মচর্য্যে লাভ কি? এই প্রশ্নের উত্তর মহর্ষি পতঞ্জলির যোগসূত্রে পাওয়া যায়,—

"ব্রহ্মচর্য্য-প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ।"

ব্রহ্মচর্য্যপালনের ফল—বীর্য্যলাভ।

যেহেতু আমরা বিলাসিতায় মজিয়া, অলস অকর্ম্মণ্য হইয়া, দিন দিন বল-বীর্য্যহীন হইতেছি, অতএবই আমাদের বিলাসিতা-বর্জ্জন ও ব্রহ্মচর্য্যপালন একান্ত আবশ্যক। "Chastity is Life, sensuality is Death," পবিত্রতারক্ষণে জীবন, ইন্দ্রিয়পরতায় মরণ। বদ্‌মেজাজ ইন্দ্রিয় ও মনের বদ-মরজিপালনই ইন্দ্রিয়পরতা ও বিলাসিতা। ইন্দ্রিয়-সেবার ফল দুর্ব্বলতা। সংযমে শক্তির উপচয়, অসংযমে ক্ষয়। দেহ, মন ও মস্তিষ্কের বল কমিতে থাকিলেই শুষ্ককাষ্ঠ হইতে হইবে। পক্ষান্তরে, দেহের রস-বীর্য্যধারণ ও মনের পবিত্রতাসাধনই ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্যপালনে সবল-সরস, সতেজ-সজীব বৃক্ষ হইতে পারা যায়।

আচার-ব্যবহার ও আহার-বিহারাদি সম্বন্ধে প্রতিনিয়ত কতকগুলি সুনিয়ম পালন করিয়া দেহকে সুস্থ, মনকে পবিত্র ও চরিত্রগঠন করা ব্রহ্মচর্য্যের উদ্দেশ্য। একার্য্য প্রথম প্রথম ক্লেশকর বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু একবার অভ্যাস জন্মিলে আর তত কষ্টকর হইবে না। অভ্যাস, স্বভাবে পরিণত হইলে, ত্যাগ করা সহজ হইবে না। সত্যকথা বলিবার অভ্যাস পাকিয়া উঠিলে মিথ্যা বলা তাহার পক্ষে বরং কষ্টকরই হইবে, যে পূর্ব্বে সত্যকথা বলিতে জানিত না। অভ্যা-

সের ফলে নিদ্রালুর পক্ষেও, আয়ুঃক্ষয়কারী অতিনিদ্রা ও দিবানিদ্রা পরিহার, ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে শয্যাত্যাগ সহজ হইবে। অভ্যাসের ফলে, প্রতিদিন যথাকালে ভগবানের মধুর-পুণ্য নামকীর্ত্তন করিতে ও শুনিতে পাপীরও প্রাণের আকাঙ্ক্ষা জাগে। যাহারা সয়তানের চেলা, তাহারা হরিনামে হিরণ্যকশিপুর ন্যায় অবশ্য কাণে আঙুল দিবে। কিন্তু বালকেরা সয়তানের শিষ্য নয়। তাহাদের কোমলপ্রাণে ভক্তি সঞ্চার করা চার্ব্বাকপন্থী গুরু ভিন্ন আর কে অপকর্ম্ম বলিয়া মনে করিবেন? পুত্রকে হরিভক্ত করিতে চেষ্টা করিলে গুরুর প্রতি হিরণ্যকশিপু ভিন্ন কোন্ পিতা রাগ করিবেন?

অবিবাহিতাবস্থায়, ছাত্রজীবন যাপন করা আবশ্যক। পঠদ্দশায় বিবাহ করিলে অনিষ্টপাতের সম্ভাবনাই অধিক। ছাত্রজীবনে কেবল আয় করিবে, ব্যয় করিবে না। কেবল শাস্ত্রচিন্তা, ‘কামিনী-কাঞ্চন’-চিন্তা থাকিবে না। ব্রহ্মচর্য্যই ছাত্রের তপস্যা। জ্ঞানই তাহার ধ্যান। ব্রহ্মচর্য্যের পর গৃহস্থাশ্রম। কর্ত্তব্যপরায়ণ গৃহী হইবার যোগ্যতা লাভের জন্য ব্রহ্মচর্য্যের প্রয়োজন। লোকহিতার্থে কেহ কেহ ইচ্ছা করিলে রঘুনাথ শিরোমণি বা ভীষ্মের ন্যায় চিরকুমার থাকিতে পারেন।

কি শিখিব?

শিখিব আমরা ইন্দ্রিয়ের প্রভু হইয়া জগৎপ্রভুর সেবা করিতে। শিখিব আমরা রিপুর দাসত্ব না করিতে।

সাধুসঙ্গ।

'সজ্জনৈঃ সঙ্গতং কুর্য্যাৎ ধর্ম্মায় চ সুখায় চ।'

হিতোপদেশ।

হবে পুণ্য, পাবে সুখ, কর সাধুসঙ্গ।

এ দেশে সাধু-সন্ন্যাসীর অভাব নাই। অভাব নাই বলিয়াই প্রকৃত সাধু বাছিয়া লওয়া বড় মুস্কিল। গৈরিকবসন, রুদ্রাক্ষমালা, কমণ্ডলু, লৌহদণ্ড, ভালে তিলক, গায়ে নামাবলী, অথবা ঈদৃশ কোন বিশেষ ধর্ম্মচিহ্নে চিহ্নিত ব্যক্তিই এদেশে 'সাধু' নামে পরিচিত। সুচরিত্র ব্যক্তি সাধু-নামের যোগ্য হইলেও, সংসারী হইলে, লোকে তাঁহাকে 'সাধু' বলিয়া ডাকে না। কিন্তু বাস্তবিক যিনি পূতচরিত্র, ধার্ম্মিক, যিনি সর্ব্বদা সৎপথে বিচরণ করেন, সন্ন্যাসী হউন বা সংসারী হউন, তিনিই সাধু। গৃহীর পক্ষে গৃহী সাধুর সঙ্গ সুলভ, সন্ন্যাসী সাধুর সঙ্গ দুর্লভ। সংসারে থাকিয়া যাঁহারা সুচরিত্র, সত্যপ্রিয়, ন্যায়বান্, তাঁহাদের সহবাস প্রত্যেকেরই বাঞ্ছনীয়, এবং অসতের সংসর্গ সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়। উন্নতচেতা বলবান্ ব্যক্তির সহবাস, হীনচিত্ত দুর্ব্বলের পক্ষে বিশেষ লাভজনক।

সৎসঙ্গের উপকারিতা ও অসৎসঙ্গের অপকারিতা বহুগ্রন্থাদিতে বর্ণিত আছে এবং ইহা প্রত্যক্ষলব্ধ। কত অসৎলোক সৎসঙ্গের গুণে উন্নত, আবার কত সৎস্বভাবাপন্ন ব্যক্তি অসৎসঙ্গের দোষে পতিত হইয়াছে, তাহা অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

সৎসঙ্গ পরশমণিতুল্য, লোহাকে সোনা করে। জগাই-মাধাই দস্যু দুই ভাই, নিতাই-নিমাইর সঙ্গলাভ করিয়া নবজীবনলাভ করিয়াছিল। রামচন্দ্র খাঁর নিয়োগে যে বেশ্যা সাধু হরিদাসের পবিত্রতা নষ্ট করিতে গিয়াছিল, সাধুর পুণ্য আশ্রমের পুণ্যবাতাসে সেই পাপীয়সী কুলটার অসাধু সঙ্কল্প উড়িয়া গেল; সাধুর কৃপায় তাহার কলঙ্কিত জীবন পবিত্র হইয়া গেল। বিষ অমৃতে পরিণত হইল। ক্রমে সেই পাপিষ্ঠা—

"প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈল পরম মহান্তী।
বড় বড় বৈষ্ণব তার দর্শনেতে যান্তি।"

সাধুসঙ্গের এমনই আশ্চর্য্য মহিমা। ফলতঃ,

"সাধূনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্থভূতা হি সাধবঃ।"

সাধুরা তীর্থস্বরূপ। তাঁহাদের দর্শনে পুণ্য হয়। আজকাল প্রকৃত সাধু নিতান্ত সুলভ না হইলেও একান্ত দুর্ল্লভ নহে। সংসারের তপ্তবায়ু মনকে তপ্ত করিয়া তোলে, তাই সময়ে সময়ে তীর্থস্থানে গমন, সাধুদর্শন গৃহীর কর্ত্তব্য। কিন্তু নিখিললোকসমাজ নিতাই-নিমাই বা হরিদাসের ন্যায় ভক্ত প্রেমিকের সঙ্গ পাইয়া পাপ তাপ দূর করিতে পারিবে, এরূপ আশা করা যায় না।

আমরা সাধারণতঃ অসাধু মন ও ইন্দ্রিয়গুলিকে লইয়া অসাধু সমাজে সর্ব্বদা বাস করি। সাধুপুরুষের ন্যায়, যে স্থান, বস্তু বা গ্রন্থের পুণ্য মহিমায় সেই অসাধুসমাজ সাধু হয়, তাহা তীর্থভূত, আমাদের সেবনীয়। তাহাও সাধুসঙ্গ। স্বর্গ-কুসুম-সুরভি, অমল-হৃৎ-কমল শিশুর নিকট অনবদ্য আনন্দ-হাসি ও সরল-পবিত্রতা শিখিয়া

আমরা গৃহকে তীর্থে পরিণত করিতে পারি। আবার, সন্তানের পক্ষে সুপিতা-সুমাতা, শিষ্যের পক্ষে সদ্‌গুরু, তীর্থসলিলের ন্যায় পুণ্যশীতল, পাবকের ন্যায় পাবন।

অসৎসঙ্গ সোনাকে লোহা করে। ব্রহ্মণতনয় গৌতম, ব্যাধের সংসর্গে থাকিয়া পক্ষিহননপটু ব্যাধত্ব প্রাপ্ত হইয়া, হিংসাপরায়ণ কুৎসিত জীবন অতিবাহিত করিয়াছিল। সঙ্গদোষে সাধু চোর হয়, যোগী যোগভ্রষ্ট হয়। এমন কি, বাঘের সঙ্গে থাকিয়া মানুষ, বাঘের প্রকৃতি পায়। আমরা শুনিয়াছি—একবার কোন এক পরিবারের একটী দুগ্ধপোষ্য শিশুসন্তানকে একটা বাঘিনী হরণ করিয়া লইয়া যায়। বাঘিনী তাহাকে প্রাণে না মারিয়া বনের মধ্যে সন্তানস্নেহে নিজ সন্তানদিগের সহিত লালনপালন করিতে লাগিল, স্তন্যপান করাইয়া বাঁচাইয়া তুলিল। ক্রমে শিশু বাড়িতে লাগিল, ক্রমে হাঁটিতে শিখিল। বাঘের মত সে তখন ডাকে, বাঘের মত হাঁটে, বাঘের মত শিকার ধ'রে আম মাংস খায়; সকল রকমেই বাঘের অনুকরণ করিয়া—বাঘের স্বভাব পাইয়া একটী ব্যাঘ্র-শিশু হইল। অনেক দিন পর দৈবাৎ তাহাকে পাইয়া লোকালয়ে আনিয়া গোদুগ্ধ পান করিতে দেওয়া হইল, কিন্তু বহু যত্নেও বাঁচিল না, কিছু কাল পরে মরিয়া গেল।

মানুষের স্বভাবই এইরূপ যে, সে একাকী থাকিতে ভালবাসে না, একাকী থাকিতে পারে না। শিশু, যুবা, বৃদ্ধ সকলেই সঙ্গী চায়। একাকী থাকা নির্জ্জনকারাবাসতুল্য ক্লেশপ্রদ। লোক-সংখ্যা ও সভ্যতার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অসৎলোকের সংখ্যাও বৃদ্ধি হওয়াই সম্ভবপর। বস্তুতঃ সাধুর সংখ্যা চিরকালই কম। সুতরাং সঙ্গ-

নির্ব্বাচনবিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক। অভিভাবক, ভাল সঙ্গী বাছিয়া না দিলে, অসৎসঙ্গে পড়িয়া বালকের সর্ব্বনাশ হইতে পারে। সঙ্গনির্ব্বাচন অতি কঠিন কার্য্য। ইহা লোকচরিত্র-জ্ঞানের উপর অনেকটা নির্ভর করে। তরলমতি বালকের তাহা নাই। বিশেষ পরীক্ষা করিয়া সঙ্গী বাছিয়া লইতে হয়, কিন্তু বালকেরা এত কষ্ট স্বীকার করিতে চায় না। তাহারা কে ভাল, কে মন্দ বিচার করে না; সঙ্গী পাইলেই তাহার সঙ্গে মিশে। এবিষয়ে পিতামাতার বিশেষ দৃষ্টি থাকা দরকার। সন্তানদিগকে যার তার সঙ্গে মিশিতে, খেলিতে ও বেড়াইতে দেওয়া কোনক্রমেই সঙ্গত নহে। অভিভাবক-হীন যুবকেরা স্বয়ংই সঙ্গ নির্ব্বাচন করিতে বাধ্য হয়। তাহাদের কর্ত্তব্য যে, যে সকল যুবক সৎ বলিয়া সুপরিচিত হইয়াছেন, প্রশংসা-পত্র পাইয়াছেন, কেবল তাহাদের সঙ্গ লাভ করা। অনেক খল প্রকৃতির লোক ধনী যুবকের বন্ধুত্ব কামনা করিয়া থাকে; বাহিরের মধুর ব্যবহার ও মিষ্টকথায় ভুলিলেই ঠকিতে হইবে।

"দুষ্ট মানুষের মিষ্টকথা, ঘনায়ে বসে কাছে।
কথা দিয়ে কথা নেয়, পরাণে বধে শেষে॥"

খলের ব্যবহার এইরূপই বটে। "খলের পীরিত" জলের রেখা নিতান্ত অস্থায়ী, কিছুই নয়। সংসারে 'বিষকুম্ভ-পয়োমুখ' বন্ধুর অভাব নাই। উপরে, মুখে অমৃত থাকুক, কিন্তু ভিতরে বিষ আছে কি অমৃত আছে, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা বুদ্ধিমানের কার্য্য।

অনেক সময় উত্তম সঙ্গী পাওয়া যায় না। উত্তম সঙ্গী না জুটিলে একাকী নির্জ্জনতার মধ্যে থাকা শতগুণে শ্রেয়ঃ। কিন্তু ক্ষণকালের জন্যও অসৎসঙ্গে থাকা কর্ত্তব্য নয়। সাধারণতঃ উত্থান বহু আয়াস-

সাধ্য, পতন অযত্নসুলভ। উত্থান সময়সাপেক্ষ, পতন মুহূর্ত্তমধ্যে সম্ভাব্য। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ, দেহের সঙ্গে আমাদের মনটাকেও যেন মাটীর কাছে, নীচে টানিয়া রাখিতে চায়। অসৎসঙ্গ পৃথিবীর এই কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করে; ক্ষণকালের মধ্যে মানুষের অধঃপতন ঘটাইতে পারে। কিন্তু সাধুসঙ্গ—মনের ব্যোমযান; মানুষকে ঊর্দ্ধে লইয়া যায়।

সৎলোকের সহবাস সুলভ না হইলেও বর্ত্তমানকালে মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবে সদ্‌গ্রন্থের অভাব নাই। সাধুর ন্যায় সদ্‌গ্রন্থ স্বর্গস্বরূপ। অসাধুর ন্যায় অসদ্‌গ্রন্থ নরকসদৃশ। সদ্‌গ্রন্থের ন্যায় চিরহিতকারী, বিশ্বস্ত বান্ধব বিরল। অসদ্‌গ্রন্থ পরম শত্রু। অকৃত্রিম বন্ধুলাভ পরম সৌভাগ্যের বিষয়, এরূপ সৌভাগ্য জীবনে অনেকেরই হয় না। কিন্তু আমরা ইচ্ছা করিলে সদ্‌গ্রন্থরূপ পরমবন্ধু চিরদিনের জন্য অনায়াসে পাইতে পারি। এই বন্ধু সম্পদে-বিপদে সর্ব্বদাই আমাদের সহায়। শোকে সান্ত্বনা দেয়, দুশ্চিন্তা দূর করিয়া সুচিন্তা জাগায়।

"চিতাচিন্তাদ্বয়োর্মধ্যে চিন্তৈব চ গরীয়সী।
চিতা দহতি নির্জীবং চিন্তা দহতি জীবিতম্॥"

চিতা ও চিন্তা এই দুয়ের মধ্যে চিন্তাই অতি ভয়ঙ্কর। চিতা কেবল মৃতকে দগ্ধ করে, চিন্তা তাজা মানুষকে পোড়াইয়া মারে। এ হেন জ্বালাময়ী চিন্তার হাত হইতে সদ্‌গ্রন্থের অনুগ্রহে আমরা নিস্তার পাই। ইহার সাহায্যে আমরা প্রাচীন ও বর্ত্তমান যুগের ঋষিকল্প জ্ঞানিগণের সঙ্গলাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি। মৃত মহাত্মাদিগের চিন্তা, কার্য্যকলাপ, আশা-উৎসাহ আমাদের জীবনের অন্ধকার-

ময় পথে আলোকবর্ত্তিকাস্বরূপ। তাঁহাদের অতীত চরিত্র আমাদের নিকট বর্ত্তমানবৎ প্রত্যক্ষ হয় এবং বিপদে ধৈর্য্য, সম্পদে ক্ষমা, যশে স্পৃহা, বিদ্যায় অনুরাগ প্রভৃতি পুরুষোচিত গুণ শিক্ষা দেয়। কাল ও স্থানের দূরবর্ত্তিতায় যে সকল মহানুভব ব্যক্তির সহবাসে আমরা বঞ্চিত, গ্রন্থ আমাদিগকে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎকার ও আলাপ-পরিচয় করাইয়া দেয়। কবি সাদির (Southey) ন্যায় যিনি সত্য-সত্যই বলিতে পারেন—"My days among the dead are past," পরলোকগত মহাপুরুষদিগের সহবাসে আমার জীবিতকাল অতিবাহিত হইয়াছে, অথচ সাধুসঙ্গের ফল পান নাই, তবে নিশ্চয়ই তাঁহার গ্রন্থপাঠ বিড়ম্বনার একশেষ।

সঙ্গী নির্ব্বাচনের ন্যায় গ্রন্থনির্ব্বাচন দুরূহ কার্য্য না হইলেও এ বিষয়েও পূর্ব্বাহ্ণে সতর্কতা অবলম্বন না করিলে বিশেষ বিপদাশঙ্কা। কুৎসিত পুস্তকের কুরস আস্বাদন করিয়া বালকদিগের কুরুচি জন্মিলে তাহা ত্যাগ করান শেষে কঠিন হইয়া পড়ে। খারাপ পুস্তক পড়িয়া তাহাদের চরিত্রে দোষ জন্মে। জ্ঞানবৃদ্ধ গুরুজনের এই সম্বন্ধে তীক্ষ্ণদৃষ্টি থাকিলে তাহাদের অনেক উপকার হইতে পারে। কার পক্ষে কোন্ শ্রেণীর পুস্তক উপযোগী, তাহা বয়স্ক যুবকগণ নিজেরাই মনোনীত করেন।

"আপ্-রুচি খানা, পর্-রুচি পর্না।" পরের রুচি অনুসারে যখন যেমন ফ্যাশন, সেই অনুসারে পোষাক করিতে হয়। কিন্তু খাওয়াটা নিজের রুচিমত হওয়া চাই, তা না হইলে তৃপ্তি হয় না, অসুখও হইতে পারে। অধ্যয়নও আহারবিশেষ, মনের আহার। কিন্তু সংসারে প্রবেশ করিলেই আমাদের মধ্যে অনেকের পুস্তকে

ভয়ানক অরুচি জন্মিয়া থাকে। অরুচি ও কুরুচি উভয়ই অনর্থের মূল। দূর করা আবশ্যক।

কুগ্রন্থের কুফল হলাহলতুল্য। ইহা মানুষকে বিলাসী, বিধর্ম্মী, গুরুদ্বেষী, সংশয়বাদী নাস্তিক করিতে পারে; সমাজে বিপ্লব ঘটাইতে পারে। একথা কে অস্বীকার করিবেন?

লণ্ডনরহস্য (Mysteries of the Court of London), ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কি লোকের কুরুচিতে ইন্ধন যোগায় নাই? ইটালীর গ্রন্থকার ম্যাকিয়াভেলির (Macchiavelli) গ্রন্থ পড়িয়া কেহই কি কুনীতির আশ্রয় লয় নাই? চার্ব্বাকদর্শন বা তত্তুল্য ইউরোপীয়দর্শন কি কাহারো মনে সংশয়বাদ বা নাস্তিকতা জাগায় নাই? ফরাসী লেখক রুসোর (Rousseau) গ্রন্থাবলী, বিশ্বপ্লাবী ফরাসী-বিপ্লব ঘটাইতে কি কিছুমাত্র আনুকূল্য করে নাই?

পক্ষান্তরে সুগ্রন্থের সুফল অমৃতোপম। ইহা মানুষকে মানুষ করে, দেবতা করিয়া তোলে, গুরুভক্ত, ঈশ্বর-প্রেমিক করে, সমাজকে সংস্কৃত, উন্নত করে। এডিসনের (Addison) লেখা পার্লেমেণ্টের বিধিবিধান অপেক্ষাও তদানীন্তন সমাজের অধিক উপকার করিয়াছে। প্রেমিক হাফেজের গ্রন্থ কত লোকের হৃদয়ে ভগবৎপ্রেমের সঞ্চার করিয়াছে। গীতা কত কত ধার্ম্মিককে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মযোগ শিক্ষা দিয়াছে, দিতেছে।

সদ্‌গ্রন্থের একটা লক্ষণ এই যে,—শতবার পড়িলেও আর একবার পড়িতে ইচ্ছা হয়; প্রত্যেক বারেই নূতন বলিয়া বোধ হয়। যৌবনে বা বার্দ্ধক্যে যখনই পড়া যায়, তখনই নূতন আনন্দ পাওয়া যায়। সেই পুস্তকই উত্তম, যাহা অজ্ঞাতসারে আমাদের চরিত্রগঠনে সহায়তা করে,

যাহা মনের সুখ জন্মাইয়া আমাদিগকে ধর্ম্মের দিকে, মঙ্গলের দিকে লইয়া যায়। সেই পুস্তকই উত্তম, যাহা আমাদের আভ্যন্তরীণ উন্নতি-বিধান করিয়া ভগবানের কাছে পৌঁছিবার পথ দেখাইয়া দেয়।

প্রত্যেক জাতিরই একটা বিশেষত্ব, বিশেষ চরিত্র আছে। ইহাই এক জাতিকে অপর জাতি হইতে পৃথক্ করে। ইহার অস্তিত্বে জাতির অস্তিত্ব, বিলোপে জাতির বিলোপ বা বিলয়। সুতরাং ইহা রক্ষা করা প্রত্যেক জাতির কর্ত্তব্য। জাতীয় গ্রন্থাবলী এই বিশেষত্বটাকে বজায় রাখিবার জন্য সমাজকে আনুকূল্য করে। যে গ্রন্থ সমগ্র সমাজ-হৃদয়কে স্পর্শ করে, যাহার প্রভাবে সকল লোকের হৃদয়-তন্ত্রী একসুরে বাজিয়া ওঠে, যাহা সমাজে শক্তি সঞ্চার করে, তাহা মহাগ্রন্থ।

এদেশে নিরক্ষর লোক বহুতর। আগে কথকতা প্রভৃতি উপায়ে তাহারা রামায়ণাদি মহাগ্রন্থ শুনিয়া শুনিয়া জাতীয় ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে সুযোগ পাইত। এখন সে সুবিধা পায় না। শিক্ষিতসম্প্রদায়ও এ বিষয়ে উদাসীন। জাতীয় মহাগ্রন্থ আমাদের হৃদয়-শোণিত, অত্যাজ্য। সুতরাং ইহা আমরা শুনিব শুনাইব, পড়িব পড়াইব। আবার, নানা ভাষায় নানা শ্রেণীর নানাগ্রন্থ রাশীকৃত রহিয়াছে। তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট কাব্য, সাহিত্য, জীবনবৃত্ত ও ইতিহাস সাধারণ পাঠকের অধ্যয়ন-যোগ্য; উকীল, মোক্তার, ডাক্তার, দারোগা প্রভৃতি বিশেষজ্ঞেরও অপাঠ্য নহে।

প্রাচীন ভারতে জীবন-চরিতের বিশেষ অভাব ছিল; সুখের বিষয়, এখন সে অভাব পূর্ণ হইতেছে। যে দেশে মহৎ ও সাধুলোকের সংখ্যা অধিক এবং জীবনবৃত্তের সংখ্যাও তত্তুল্য, সেই দেশ ধন্য। পুণ্য জীবন-চরিতের সংখ্যা যতই অধিক এবং জনসমাজে যত অধিক

প্রচলিত হয়, ততই দেশের মঙ্গল। ইহাতে গুণীর সমাদর করা হয় এবং মহৎ চরিত্রের অনুকরণে নিজ নিজ চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করিয়া লোকসকল মহত্ত্বলাভ করিতে সমর্থ হয়।

মহাপুরুষের ন্যায় মহাগ্রন্থ অমর। ইহা প্রাচীন হইয়াও চিরনবীন। ইহাতে যে সকল মহাসত্য নিহিত থাকে, তাহা চিরশ্যামল, চিরপবিত্র। প্রাচীন হইয়াও প্রাচীন সমাজ-শরীরে নবপ্রাণ সঞ্চার করে। যে জাতির একখানিমাত্রও মহাগ্রন্থ আছে, সে জাতি ধন্য। হিন্দুজাতি এ বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা সৌভাগ্যশালী। হিন্দুর ঋগ্বেদ আছে, রামায়ণ আছে, মহাভারত আছে। এইরূপ তিনখানি মহাগ্রন্থ অন্য কোন জাতিরই নাই। এই তিনের প্রত্যেকখানিই ইতিহাস, প্রত্যেক-খানিই কাব্য, প্রত্যেকখানিই ধর্ম্মগ্রন্থ। ঐতিহাসিকের নিকট এই তিনই অতি আদরের বস্তু। কাব্যরসিক এই তিন গ্রন্থ পাঠে বিমল কাব্যামোদ ভোগ করিতে পারেন; এবং ধর্ম্মপিপাসু অমূল্য ধর্ম্মতত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া কৃতকৃত্য হইতে পারেন। এ হেন মহাগ্রন্থ আমাদের জীবনের প্রিয়-সহচর হইলেই সৌভাগ্য; অন্যথা দুর্ভাগ্য। পরিতাপের বিষয় এই যে, অধিকাংশ বাঙালীরই বিদ্যালয়ত্যাগের পর গ্রন্থের সহিত চির-বিচ্ছেদ ঘটিয়া থাকে। স্বাভাবিক আলস্য ও দুর্ব্বলতা ব্যতীত ইহার আরো কয়েকটী কারণ অনুমান করা যায়।

কোন দেশেরই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি একথা বলে না যে, আমরা ছাত্রদিগকে সম্পূর্ণ বিদ্বান্ করিয়া দিতেছি, বরং ইহাই বলে যে, উহাদিগের জ্ঞানার্জ্জনশক্তি ও প্রবৃত্তি জাগাইয়া দিতেছি মাত্র। এই উদ্দেশ্যে সিদ্ধ হইলেই বিদ্যালয় কৃতার্থ। কিন্তু কোন কোন যুবক পাশ বা উপাধি পাইয়াই মনে করেন, আমরা বিদ্বান্ হইয়াছি। কত অসংখ্য

লোকের উপাধি নাই, আমরা নিশ্চয়ই তাহাদের উপরে! আমরা তাহাদের চেয়ে বহুবিদ্যা অর্জ্জন করিয়াছি। এই ভাবের সহিত প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্নভাবে অবিনয় দেখা দেয়। "বিদ্যা দদাতি বিনয়ম্"। বিদ্যা জন্মিলেই যে বিনয় আপনা হইতেই আসে, তাহা অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় না। বরং বিদ্যা দদাত্যবিনয়ম্। আজকাল বিদ্যায় অবিনয় জন্মাইয়া দেয়। শতেক নিরুপাধি ব্যক্তির মধ্যে একজন উপাধিবিশিষ্ট লোক বিচরণ করিতে থাকিলে, তাহার মনে একটা গর্ব্ব আসা অস্বাভাবিক নহে। তিনি তখন, "হংসমধ্যে বকো যথা" হংসসকলের মধ্যে বক না হইয়া, বকমধ্যে যথা হংসঃ, বকসকলের মধ্যে হংস, এরূপ বিবেচনা করেন। ধনের ন্যায় বিদ্যা অসংযমীর মনে মদ জন্মায়। অবিনয় ও বিদ্যামদ বিদ্যামোদে বিঘ্ন ঘটায়।

কেহ কেহ কিছু ইংরাজি শিখিয়া, দু' চারি খানি ইংরাজি বই পড়িয়া, মনে করেন, বঙ্গভাষায় তাঁহাদের পড়িবার কিছুই নাই, সুতরাং বাঙ্গালা পুস্তক স্পর্শ করেন না। কিন্তু তাঁহারা জানেন যে, কোন সভ্যজাতিই মাতৃভাষার অনাদর করেন না; কোন সমাজই মাতৃ-ভাষায় উপেক্ষা করিয়া সভ্য হয় নাই।

চাকরি লাভই পাঠশালায় প্রবেশের মুখ্য উদ্দেশ্য। উপাধি লইয়া, বিদ্যালয় হইতে বাহির হইলে, নিরুপাধি উমেদারের অপেক্ষা যখন ভাল চাকরি জোটে, তখন তাহার মনে একটা আত্মপ্রসাদ জন্মে এবং মনে হয়, বিদ্যার্জ্জনের উদ্দেশ্য এতদিনে সুসিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং এখন আর পুস্তকের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা নিষ্প্রয়োজন।

যিনি যতটা পাশ বা উপাধি পাইয়াছেন, তিনিই সেই পরিমাণে বিদ্যাপারদর্শী হইয়াছেন, এরূপ ধারণা নিজের ও সমাজের পক্ষে

অমঙ্গলজনক। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এভাব ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিলেই মঙ্গল।

জ্ঞানের সহিত বিনয়ের অতি নিকট সম্বন্ধ। জগতের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতগণ একথার প্রমাণ। কবিকুল-তিলক কালিদাস রঘুবংশ কাব্যে বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। কিম্বদন্তী বলে—কালিদাস বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নিরেট বোকা ছিলেন, কেবল সরস্বতীর বরে হঠাৎ কবি হইয়াছিলেন। কিন্তু আসল কথা এই যে, তিনি অশেষপারদর্শী পণ্ডিতকবি। তাঁহাতে অসামান্য কবিপ্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের মণিকাঞ্চন যোগ হইয়াছিল।

ইংলণ্ডীয় সমাজে তদানীন্তন কালের শ্রেষ্ঠ মনীষী নিউটনের বিনয়ের কথা, গ্রন্থে, গুরুশিষ্যমুখে অনেক শুনা যায়। নিউটন সমগ্র জীবনের অসাধারণ জ্ঞানরাশি লইয়া মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন, "অপার জ্ঞানসমুদ্র পুরোভাগে বর্ত্তমান, আমি তীরে থাকিয়া কয়েকটী বালুকা সংগ্রহ করিয়াছি মাত্র।"

গ্রীশদেশের ঋষিতুল্য মনস্বী সক্রেটিস্ বিনয়ের অবতার ছিলেন। একদিন ডেলফির দেবমন্দিরে দৈববাণী হইল যে, সক্রেটিস্ গ্রীশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী। তাঁহার শিষ্যগণ আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাঁহাকে এই সংবাদ দিলেন। দেবতা ও দৈববাণীতে তাঁহার বিশ্বাস ছিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, এ কেমন করিয়া সম্ভবে? আমি যে অল্পজ্ঞ, আমি কি জানি? অনেক পণ্ডিতই ত আমাপেক্ষা অধিক জ্ঞানী। দৈববাণী পরীক্ষার জন্য তিনি এথেন্সের বড় বড় পণ্ডিতদিগের নিকট যাইয়া আলাপ করিতে লাগিলেন। আলাপ করিয়া বুঝিলেন, ইঁহারা কেহই নিজের মূর্খতা বোঝেন না। সক্রেটিস্ কিন্তু নিজের অজ্ঞতা বিলক্ষণ

বুঝিতেন। এই হিসাবে তিনি দৈববাণী অভ্রান্ত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন।

ক্ষমতা পাইলে অনেক যুবক উদ্ধত, অবিনয়ী হয়। কিন্তু প্রভুত্ব, ধন, মান বা জ্ঞান মহাত্মাদিগের স্বাভাবিক বিনয়কে শতগুণে বর্দ্ধিত করে। জাপানের নৌ-সেনাপতি আডমিরাল টোগো যিনি গত রুশজাপ যুদ্ধে অসামান্য রণনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া জগৎকে বিস্মিত করিয়াছিলেন, তিনি অতি-মধুরভাষী, বিনয়ের আধার।

বস্তুতঃ যিনিই জ্ঞানসমুদ্রে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনিই ইহার বিশালতা ও গভীরতা অনুভব করিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছেন। তখন তাঁহার মনে হয়, আমি কি জানি? এই বিশাল বিশ্ব সমুদ্রের একটী তরঙ্গ, একটী বুদ্‌বুদের জ্ঞানও ত আমার নাই। আবার মনীষীদিগের রচিত গ্রন্থনিচয়েও একথারই পোষকতা করে। একখানি গ্রন্থ পড়িলেই মনে হয়, কত পড়িবার ও শিখিবার আছে, আমি কি শিখিয়াছি, কি জানি? কত অসংখ্য পুস্তক অপঠিত রহিয়াছে, যাহা না পড়িলেই বুঝি মূর্খত্বই ঘোচে না। শাস্ত্র অনন্ত, জ্ঞানসমুদ্র অনন্ত, সান্ত মানবের সাধ্য কি তাহার অন্ত পায়? ভগবদ্‌বিরচিত বিশ্বগ্রন্থ ছাড়িয়া দিয়া, কেবল মনুষ্যপ্রণীত গ্রন্থরাশির অধ্যয়নে সমগ্র সুদীর্ঘ জীবন যাপন করিলেও সেই গ্রন্থরাশির অতি অল্পাংশমাত্রই শিক্ষা করা যাইতে পারে। স্কুল-কলেজের নির্দ্দিষ্ট কয়েকখানি পুস্তকের অংশবিশেষ, পাঁচ সাত বৎসর পড়িয়া কোন মেধাবী যুবকও পাণ্ডিত্যলাভে সমর্থ নহে। একথা মনে থাকিলে কেহই জ্ঞানগর্ব্বে স্ফীত হইতে পারে না।

পড়া ও পরীক্ষার চাপে বাল্যকালেই অনেকের মানসিক বৃত্তিগুলি সতেজ না হইয়া নিস্তেজ, পুষ্ট না হইয়া পিষ্ট হইতে থাকে। অবশেষে তাহারা যৌবনকালে সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া অবসন্ন, অর্দ্ধমৃত অবস্থায় কালযাপন করে। পুঁথির খবর লইবার না থাকে রুচি, না থাকে অবসর। রুচি থাকিলেও কেহ কেহ অর্থের অভাবে গ্রন্থের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া থাকে। তাহাদের "অন্নচিন্তা চমৎকারা।" তাহারা অন্নচিন্তায় চারিদিক্ অন্ধকার দেখে।

কোন বস্তু বা বিষয়ের মধুর স্বাদ পাইলে, লোকে তাহা সহজে ছাড়িতে চায় না। গ্রন্থাধ্যয়নের একটা রস না পাইলে শিক্ষার্থীদিগের উহাতে আন্তরিক বিদ্বেষ-বিতৃষ্ণা জন্মে। কেবল প্রয়োজনের খাতিরে বিদ্যালয়ে থাকাকালীন উহারা নিতান্ত বাধ্য হইয়া পুস্তকগুলির কিছু খাতির করিয়া থাকে। আপাততঃ কার্য্যসিদ্ধি হইলে আর খাতির করিবে কেন? উহারা তখন 'খাতির নাদারৎ'। বেকন (Bacon) বলিয়াছেন,—"To spend too much time in studies is sloth" ইঁহারাও বুঝি সেই কথার পুনরাবৃত্তি করিয়া বলেন,—অধ্যয়নে অধিক সময় ক্ষেপণ করা অন্যায়, ইহাতে অলসতা বৃদ্ধি পায়।

গ্রন্থ-অধ্যয়নের অন্যতম ফল, স্বাধীনচিন্তার উদ্বোধন। পরের মুখে অন্ন চাখিলে কোন ফল নাই। পরের সুচিন্তা, পরের সদ্ভাবগুলিকে আত্মসাৎ করিয়া আপনার করিয়া লইতে পারিলে লাভ আছে। গ্রন্থের সাহায্যে নিজের চিন্তাশক্তির উন্মেষ ও হৃদয়স্থ ভাবগুলিকে নির্ম্মল-উজ্জ্বল করিতে পারিলেই গ্রন্থাধ্যয়ন সার্থক। কিন্তু অনেকেই স্বাধীনচিন্তায় বঞ্চিত। আমরা সকল বিষয়েই অন্যে

তুষ্ট। কিন্তু "অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী"। অল্পজলের সফরীমৎস্য নিশ্চয়ই অনুপাদেয়, শ্লেষ্মাকারক। পক্ষান্তরে, অগাধজলের রোহিতমৎস্যের মস্তক কেমন উপাদেয় ও উপকারক। বাস্তবিক সদ্‌বিদ্বান্ সমাজের পরম হিতকারী। অল্পবিদ্যা তেমনি অপকারী। 'বিদ্যা কামদুঘা ধেনুঃ'। বিদ্যা কামধেনু। ইহার নিকট যাহা চাওয়া যায়, তাহাই পাওয়া যায়। কিন্তু ইহার নিকট না চাই ধর্ম্ম, না চাই চরিত্র, না চাই মোক্ষ; চাই কিঞ্চিৎ অর্থ। ইহাতেই আমরা হৃষ্ট।

বাঙালীর চরণ আছে, চলন নাই; নয়ন আছে, দর্শন নাই; মস্তিষ্ক আছে, আবিষ্কার নাই; বাঙালী ছাত্র প্রতীচ্য সভ্যজাতির সহিত প্রতিযোগী পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়া মস্তিষ্ক ও অধ্যয়নক্ষমতার পরিচয় দিয়া থাকেন বটে, কিন্তু কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া আর তুল্যযোগিতা রক্ষা করিতে পারেন না। ইদানীং যে সকল অভিনব তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার কোন্‌টাতে বাঙালীর কৃতিত্ব? দর্শনে, বিজ্ঞানে, শিল্পে কিছুতেই নয়। অবশ্য শ্রীমান্ জগদীশচন্দ্র কৃতিত্বের বিলক্ষণ পরিচয় দিয়াছেন। তিনি বাঙালীর গৌরব, সন্দেহ নাই। কিন্তু তাঁহার প্রদর্শিত পথের পথিক কয়জন?

পাদচারণে যেমন পদশক্তি বাড়ে, সেইরূপ নিজের চক্ষে বস্তু পর্য্যবেক্ষণে ও পরীক্ষণে দর্শন ও মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি পায়। পরকীয়চিন্তাপ্রসূত গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ এ বিষয়ে সহায়মাত্র।

কেহ কেহ বলেন,—মুমূর্ষুদশায় উপনীত স্থবিরের নিকট আমরা যেমন বড় একটা প্রত্যাশা করিতে পারি না, সেইরূপ স্থিতিশীল প্রাচীনসম্প্রদায়ের নিকট আমাদের কোন আশা নাই। তাঁহারা

প্রাচীনতা লইয়া বিব্রত। তাঁহারা, "আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী," শাস্ত্রের জ্ঞান অপেক্ষাও আবৃত্তিকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া আবৃত্তিতেই সন্তুষ্ট; তত্ত্বানুসন্ধানে নিশ্চেষ্ট। নব্যসম্প্রদায়ের উপরই সমাজের আশা ভরসা। কিন্তু ইঁহারাও যখন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য কেবল পাঠ্যতালিকানির্দ্দিষ্ট পুস্তক কয়খানির সহিত সংস্রব রাখিয়া 'আবৃত্তিঃ সর্ব্বশাস্ত্রাণাং বোধাদপি গরীয়সী', এই ভাবই প্রদর্শন করেন, কেবল আবৃত্তিকেই সার বলিয়া বোঝেন, তখন কোন্ সহৃদয় সামাজিকের মনে আঘাত না লাগে? অবশ্য অর্থ বুঝিয়া, মর্ম্মজ্ঞ হইয়া আবৃত্তি করা যে উত্তম, তাহা কে অস্বীকার করিবে? শঙ্করাচার্য্য যেমন সমগ্র বেদ কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন, তেমনি অর্থগ্রহণেও অলৌকিক বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন! ইহা অতীব প্রশংসার কথা।

বিনা দোষে বন্ধুত্যাগ যেমন বন্ধুর অকর্ত্তব্য, গ্রন্থত্যাগও তেমনি নির্ব্বোধের কর্ম্ম। 'অত্যাগসহনো বন্ধুঃ' বন্ধুবিয়োগ বন্ধুর অসহ্য। গ্রন্থকে যদি আমরা যথার্থ ই বন্ধু বলিয়া মনে করি, তবে তাহাকে নিজে ইচ্ছা করিয়া কোন্ প্রাণে বিদায় দিতে পারি? যে বন্ধু আমাদের অশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছে, এবং সর্ব্বদাই করিতে প্রস্তুত, তাহার অনাদর করা কৃতঘ্নতা। যে গ্রন্থ আমার অন্ন-সংস্থানের উপায় করিয়া দিয়াছে, যার প্রসাদে আমি চাকরি পাইয়া টাকার মুখ দেখিতে পাইতেছি, সুখের দিন আসিতেই যদি সেই উপকারী বন্ধুকে একেবারে ভুলিয়া যাই, তবে সে রাগ করিয়া বলিতে পারে—তুমি অকৃতজ্ঞ, আর তোমার উপকার করিব না।

গ্রন্থের সহিত চিরকাল বন্ধুত্ব রক্ষা করা বিজ্ঞের কার্য্য। শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই নিজের একটী পুস্তকাগার থাকা আবশ্যক। গ্রন্থহীন

গৃহ আর আত্মাশূন্য দেহ উভয়ই তুল্য। সদ্‌গ্রন্থরাশি মানসিক ও আধ্যাত্মিক সুখাদ্যের ভাণ্ডার। ইহারা মনের ও আত্মার খাদ্য যোগায়। শরীরপোষণের জন্য অন্নজলাদি ভৌতিক দ্রব্যের ন্যায়, মন ও আত্মার পুষ্টির জন্য খাদ্যবিশেষের একান্ত প্রয়োজন। আমরা অন্নগতপ্রাণ। বিনা অন্নে প্রাণ বাঁচে না। ভৌতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ অন্নই প্রাণদ। এই ত্রিবিধ অন্নের জন্য অর্থব্যয় অপব্যয় নহে, সদ্ব্যয়। মাসিক আয়ের অনুপাত অনুসারে অন্নবস্ত্রাদির সঙ্গে সঙ্গে মাসে মাসে পুস্তক ক্রয়ের ব্যবস্থা করা আমাদের অবশ্য-কর্ত্তব্য। যখন যখন আমাদের পড়িবার সখ হয়, তখনই হয়ত পরের নিকট হইতে পুস্তক আনিয়া সখ মিটাই। কিন্তু পরের পোষাক বা পরের পুস্তক ধার করিয়া কেবল ঠেকা কাজ চালাইতে পারা যায়, সর্ব্বদার কাজ চলে না। পুস্তকই হউক, আর পোষাকই হউক, ধার করা ভদ্র-লোকের পক্ষে লজ্জার কথাও বটে। অতি বড় পুস্তকালয় (Library) করিতে না পারিলেও অতি উত্তম কতিপয় বাছা বাছা পুস্তক কিনিয়া নিজ সম্পত্তি করিয়া রাখা এবং সেই সম্পত্তি ভোগ করা উচিত। কেবল আল্‌মিরার শোভার্থ পুস্তক রাখিলে চলিবে না, ভোগ করা চাই। আড়ম্বরপ্রিয় অলস ধনীরা কেবল 'নাম্‌কা ওয়াস্তে,' নামের জন্য লাইব্রেরি সাজাইতে পারেন। কিন্তু জ্ঞানার্থীর পক্ষে এরূপ করা শোভা পায় না।

চিরজীবন অধ্যয়নশীল হইতে হইবে বটে, কিন্তু গ্রন্থকীট হওয়া বাঞ্ছনীয় নহে। অমিতভোজনে উদরের, অতি অধ্যয়নে মস্তিষ্কের অজীর্ণরোগ জন্মে। সৌভাগ্যের বিষয়, বাঙালীর মধ্যে গ্রন্থকীটের সংখ্যা স্বল্পমাত্র। গ্রন্থকীটত্ব স্বল্পকালস্থায়ী। যতদিন বিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থা,

ততদিন মাত্র। ছাত্রদিগের মধ্যে এই রোগ দেখা যায়। তাহারা স্বাস্থ্যরক্ষায় উদাসীন থাকিয়া বা স্বাস্থ্যনাশ করিয়া পরীক্ষাপাশের জন্য 'ছাত্রানামধ্যয়নং তপঃ,' অধ্যয়নই ছাত্রদিগের তপস্যা, এই বাক্য পালন করিতে যত্নশীল। কিন্তু এইরূপ অধ্যয়নকে তপস্যা বলা যায় না। অধ্যয়ন অর্থে মন ও মস্তিষ্কের শক্তি বর্দ্ধন, শক্তির বিলোপসাধন নহে।

অপরাপর কর্ত্তব্যকর্ম্মের অবহেলা করিয়া সারাদিন কেবল পুস্তক লইয়া থাকা অন্যায় বটে, কিন্তু সদ্‌গ্রন্থপাঠে দিবসে অন্ততঃ দুইঘণ্টা-কাল কর্ত্তন করা সময়ের অপব্যবহার নহে। গৃহে রুদ্ধবায়ুর ন্যায় সংসারে আবদ্ধ মন দূষিত হইতে থাকে। আমরা যে সংসার-ঘর বাঁধিয়াছি, যার চারি দিকে শক্ত বেড়া দিয়া রাখিয়াছি, সদ্‌গ্রন্থ সেই ঘরের জানালা-কবাট খুলিয়া দেয়। তৈলতণ্ডুলচিন্তাকুল, বদ্ধ-আবিল মন তখন মুক্তগগনে বিচরণ করিয়া শুদ্ধ হয়, স্বস্তি পায়।

প্রতিদিন ধনার্জ্জন, প্রতিদিন পুণ্যসঞ্চয়ন, প্রতিদিন জ্ঞানার্জ্জন, প্রতিদিন বিতরণ গৃহীর কর্ত্তব্য। প্রতিদিন ক্ষুধা জন্মে, প্রতিদিনই খাইতে হয়। ক্ষুধা না জন্মিলে, শরীর-যন্ত্রে গোলযোগ ঘটিয়াছে বুঝিতে হইবে। সেইরূপ প্রতিদিন মনের ও আত্মার ক্ষুধার উদ্রেক হওয়া এবং প্রতিদিন ক্ষুধার নিবৃত্তি করা আবশ্যক। ক্ষুধা না জন্মিলে উহারা প্রকৃতিস্থ নাই, বুঝিতে হইবে।

প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে, উপনিষৎ, গীতা বা তত্তুল্য অন্য কোন ধর্ম্মগ্রন্থ শুচি-শান্ত-মনে, ভক্তিভাবে পাঠ করা গৃহী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। ভগবৎ-কৃপায় যাঁহার এমন শুভমুহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হয়, যখন তিনি ভগবানের মঙ্গলমূর্ত্তি দর্শন করিয়া পুলকিত, পবিত্র হন, তখন আর তাঁহার গ্রন্থের প্রয়োজন থাকে না। দিবালোকে দীপালোক নিরর্থক।

কি লক্ষ্য মহান্? ভূমা ভগবান্। তীর্থের তীর্থ, সাধুর সাধু, বিশ্ব-বন্ধু ভগবানের সঙ্গলাভ করাই মানবজীবনের মহান্ লক্ষ্য। সেই মহাসাধুর সঙ্গলাভ করিতে পারিলেই গ্রন্থপাঠ সম্পূর্ণ সার্থক, জীবন সার্থক।

কি শিখিব?

শিখিব আমরা—উত্তমপুস্তক পড়িয়া, উত্তমপুরুষের সঙ্গে থাকিয়া, পুরুষোত্তমের সঙ্গলাভ করিতে।

ইচ্ছা।

"তৎ ঐক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়।"

"তৎ তেজঃ অসৃজত।" শ্রুতি।

"And God said—

"Let there be light, and there was light."

(*Bible.*)

পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলেন,—জগৎ গড়িব। অমনি আকাশ-আলোক-জল জন্মিল, জগৎ রচিত হইল। কার্য্য (effect)—জগৎ, কারণ (cause)—ভগবানের কামনা। আমরা তাঁহারই ইচ্ছায় ইচ্ছা পাইয়াছি। আমাদেরও কৃত কার্য্যের কারণ আমাদের ইচ্ছা। ইচ্ছা ব্যতীত কার্য্য হয় না, জগৎ রক্ষা হয় না। তাই বুঝি ভগবান্ মানবকেও ইচ্ছা দিয়াছেন। এই ইচ্ছা লইয়াই মানব কর্ম্মে ব্যাপৃত, কর্ম্মে ব্যাপৃত থাকিয়া, উন্নত, সভ্য ও সুখী। ইচ্ছা বর্ষাকালীন নদী-স্রোতের ন্যায় বেগবতী না হইলে, মহৎকার্য্য সম্পাদন হয় না। কুইচ্ছা পরিহারপূর্ব্বক সুইচ্ছা জাগাইয়া তাহাকে বড় করিতে পারিলেই মহৎ-কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। মরজগতে মরদেহ লইয়া অমরত্বলাভ করিব, এইরূপ একটা জীবনব্যাপিনী মহতী ইচ্ছা জাগিলে লোকে মহত্ত্ব ও অমরত্ব লাভের অধিকারী হইয়া থাকে।

বাষ্প যেমন বাষ্পীয়যানে, ইচ্ছাও সেইরূপ জড়দেহে গতি দান

করে। ইচ্ছাই কর্ম্মের প্রসূতি। আমাদের ইচ্ছা ক্ষুদ্র, খণ্ডীকৃত, অল্পেই লূতাতন্তুর ন্যায় ছিন্ন হইয়া যায়। ইহাতে বেগ নাই, বল নাই। লূতাতন্তুর ন্যায় ক্ষীণ ও ক্ষণভঙ্গুর ইচ্ছা লইয়া কাজের মত কাজ কিছুই করা যায় না। ক্ষুদ্র, ক্ষীণ বাসনার ফলে কেবল পশুপক্ষ্যাদির ন্যায় পানভোজনে লোক নিযুক্ত থাকে। ইহাতে মনুষ্যজীবন সফলতা-লাভ করিতে পারে না। সাধু উন্নত ইচ্ছাই মানুষের বিশেষত্ব ও বিশেষ স্বত্ব।

ইচ্ছার শক্তি ও প্রভাব অসীম। যেখানে ইহার বেগবল নাই, সেখানে মহৎ কর্ম্মোদ্যম নাই, অধ্যবসায় নাই; সেখানে আলস্য, দীর্ঘ-সূত্রতা, কর্ত্তব্যের অনাদর, উপেক্ষা।

বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতে চাণক্যপণ্ডিত বর্ত্তমান ছিলেন। জীবনে তাঁহার সর্ব্বপ্রধানকার্য্য—নন্দবংশের উচ্ছেদসাধন। নন্দরাজকর্ত্তৃক নিজকে অপমানিত মনে করিয়া তিনি ভীষণ প্রতিজ্ঞা করিলেন,—যে উপায়েই হউক, এ অপমানের প্রতিশোধ লইতেই হইবে। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের অন্তর প্রতিহিংসানলে দিবানিশি জ্বলিতেছিল। প্রতিহিংসা, প্রতিহিংসা, এই কথাই কেবল তাঁহার মনে অনুদিন জাগিতে লাগিল। তিনি উক্ত রাজকুলের বিলোপ করিবার দুর্জ্জয় বাসনা লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাই তাঁহার কামনা-সাধনা, ইহাই তাঁহার জপতপ, মন্ত্রতন্ত্র। অবশেষে কার্য্যসিদ্ধি। একজন দরিদ্র ব্রাহ্মণ প্রবলপরাক্রান্ত রাজবংশ ধ্বংস করিয়া সেই স্থলে নূতন রাজবংশের পত্তন করিলেন। তাঁহার চেষ্টার ফলে চন্দ্রগুপ্ত মগধের সিংহাসনে সমারূঢ় হইলেন। তখন কৃতকার্য্য চাণক্য বোধ হয় সগর্ব্বে সানন্দে মনে মনে বলিয়াছিলেন, জগতে অসম্ভব কিছুই নাই, ইচ্ছার অসাধ্য কর্ম্ম নাই।

অবশ্য এ হেন পরাপকারিণী ইচ্ছা আদৌ প্রশংসনীয় নহে। কিন্তু ইচ্ছার কত শক্তি, তাহা প্রদর্শন করা আমাদের উদ্দেশ্য।

ফ্রান্সদেশের অক্লান্তকর্ম্মা বার্ণার্ড পেলিসি সামান্য কাচব্যবসায়ীর পুত্র। অর্থাভাবপ্রযুক্ত তিনি বাল্যকালে বিদ্যালয়ের শিক্ষায় বঞ্চিত হইয়াছিলেন। ১৮ বৎসর বয়সে তিনি অর্থের জন্য বিদেশে নানাস্থানে প্রায় দশবৎসরকাল ঘুরিয়া ফিরিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন। অবশেষে বিবাহ করিয়া সামান্য ব্যবসা অবলম্বনে কোন প্রকারে দিন যাপন করিতেছিলেন। একদা দৈবাৎ একটী এনামেলের বাসন দেখিয়া, তাঁহার মনে ঐ প্রকার বাসন প্রস্তুত করিবার বাসনা জাগিল। ইটালীতে বহুকালপূর্ব্বে এনামেলের বাসন তৈয়ার হইত। কিন্তু কালে তাহা লুপ্ত হয়। কি প্রকারে তৈয়ার করিতে হয়, কেহই জানে না। তিনি নিজেই ভাবিয়া চিন্তিয়া একরকম মশলা প্রস্তুত করিলেন এবং মাটীর পাত্রে তাহা লেপন করিয়া আগুনে জ্বাল দিয়া পরীক্ষা করিলেন। কিন্তু চেষ্টায় কোন ফল হইল না। এখন ভিন্ন প্রকারের মশলা প্রস্তুত করিয়া আবার পরীক্ষা করিলেন। এবারও চেষ্টা নিস্ফল। বার বার চেষ্টা, বার বার নিস্ফলতা। কিন্তু পেলিসি ভগ্নোদ্যম হইলেন না, এনামেল পরীক্ষায় বিরত হইলেন না। এনামেলই তাঁহার জ্ঞান-ধ্যান। নিজ ব্যবসায়ের কাজ একপ্রকার ছাড়িয়া দিয়াছেন। অর্থ উপার্জ্জনে আর তাঁহার মন নাই। পরিবারে দারিদ্র্যের উপর দারিদ্র্য উপস্থিত। স্ত্রী পুত্রের দুঃখ-দুর্গতিতে, কাতর বিনয়ানুনয়ে ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি টাকা ব্যয় করিয়া কেবল এক মশলার পরিবর্ত্তে অন্য মশলা প্রস্তুত করিয়া পরীক্ষা করেন! কতবার জ্বাল দিলেন, কত কাষ্ঠ জ্বালাইয়া ভস্ম করিলেন; কিছুতেই মশলা গলে না।

স্ত্রীপুত্রের কাতর ক্রন্দনেও তাঁহার মন গলে না। প্রতিবেশী এক ভদ্রলোকের নিকট হইতে কিছু টাকা ধার করিয়া আনিলেন। তাহারও অনেকটা এনামেলের পরীক্ষায় ব্যয় করিলেন। এইরূপে অতি কষ্টে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। অবশেষে ভয়ানক অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইল। এবার পেলিসি একেবারেই রিক্তহস্ত হইয়া পড়িলেন। মসলার উপকরণ, কাষ্ঠ ও মৃৎপাত্র খরিদ করিবার টাকা নাই। কিন্তু পেলিসি দমিবার লোক ছিলেন না। নিজেই বন হইতে কাষ্ঠ আহরণ করিয়া আনিতেন। নিজেই মাটীর পাত্র প্রস্তুত করিয়া লইতেন। টাকা নাই, পেলিসিরও চেষ্টার বিরাম নাই। আবার দ্বিগুণ উৎসাহে একদিন, দুইদিন করিয়া ছয়দিন ছয়রাত্রি অবিরত এনামেলের মসলা জ্বাল হইল, তথাপি তাহা গলে না। যাহা কিছু কাষ্ঠ ছিল, সব ফুরাইয়া গেল। আর কিছুকাল জ্বাল হইলেই এনামেল হইবে, এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে পেলিসি ঘরের যত কাঠের আসবাব আনিয়া চুল্লীমুখে দিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার স্ত্রীপুত্র ঘরের বাহির হইয়া ছুটিয়া আসিল, এবং উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল, "হায়! হায়! পেলিসি পাগল হইয়াছে, পেলিসি পাগল হইয়াছে।" অবশেষে ভগবানের ইচ্ছায় পেলিসির সুদিন আসিল। তিনি কৃতকার্য্য হইয়া মনের আনন্দে এনামেল তৈয়ার করিতে লাগিলেন। এই বাসন-বিক্রয়লব্ধ অর্থে অর্থবান্ হইয়া দেশমান্য হইলেন। পেলিসির সিদ্ধির মূলে একান্ত ইচ্ছা বা মত্ততা। অদ্যাপি পৃথিবীর নানাদেশে ঘরে ঘরে এনামেলের বাসন নীরবে ইচ্ছার জয় ঘোষণা করিতেছে।

বিদ্যাসাগরের জীবন জয়শ্রীমণ্ডিত। তাঁহার সকল কার্য্যেই প্রবল-ইচ্ছা, সুতরাং সাফল্য পরিদৃষ্ট হয়। পাঠদ্দশায় তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান

অধিকার করিবেন বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাই তিনি সকল পরীক্ষায় সকলের উপরে থাকিতেন। ঘোরতর দারিদ্র্যের মধ্যে নানা-প্রকার অসুবিধা ভোগ করিয়াও প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। কেহ তাঁহার উপরে থাকিবে, ইহা তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। বাল্য-কালে যে ইচ্ছা, উত্তরকালেও সেই ইচ্ছাই তাঁহাকে সামাজিক জীবনে বাঙালীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছিল। পরোপকারই তাঁহার পবিত্রজীবনের মহাব্রত। উপচিকীর্ষা তাঁহার স্বভাব। "তং বেধা বিদধে নূনং মহাভূতসমাধিনা।" বিধাতা বুঝি তাঁহাকে ক্ষিতি-অপ্-তেজ-মরুৎ-ব্যোম এই পঞ্চভূতের ষোল আনা প্রকৃতি দিয়া গড়িয়াছিলেন। বস্তুতঃ এই বলবতী উপচিকীর্ষাই তদীয় সমুদয় কর্ম্মে বল ও সৌষ্ঠব প্রদান করিয়াছিল। মনের বলে, ইচ্ছার বলে, শরীরে প্রচুর বল আসে। তিনি তারানাথ তর্কবাচস্পতিকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার জন্য ৩০ ক্রোশ পথ হাঁটিয়া গিয়াছিলেন ও তৎপরদিবস কলিকাতায় অক্লেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার দেহে এত সামর্থ্য দিল কে? বর্ষাকালীন খরস্রোতা দামোদর নদী সন্তরণে পার হইবার শক্তি কে দিয়াছিল? তাঁহার অদ্বিতীয় কীর্ত্তিস্তম্ভ মেট্রপলিটন কলেজ প্রতিষ্ঠার মূলে কি বর্ত্তমান? বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য তিনি যে অক্লান্ত পরিশ্রম ও অকাতরে স্বোপার্জ্জিত অর্থরাশি শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় বর্ষণ করিয়াছিলেন, তাহার মূল কোথায়? সর্ব্বত্রই দেখা যায়, পরোপকারের বলবতী অব্যাহত ইচ্ছা বর্ত্তমান। এই ইচ্ছাবেগের নিকট নদীস্রোতোবেগ পরাজিত। বিদ্যাসাগরের চাকরি ত্যাগ প্রবল ইচ্ছার প্রকৃষ্ট ফল। চাকরি ছাড়িলে কিসে অন্ন সংস্থান হইবে, সে বিষয়ে ধনদরিদ্র ব্রাহ্মণতনয়ের দৃক্পাত নাই। আর

চাকরি করিব না বলিয়া যে ইচ্ছার উদয় হইল, তাহা আর কিছুতেই টলিল না। তাঁহার প্রতিজ্ঞা ভীষ্মের প্রতিজ্ঞার ন্যায় অচল অটল। সেই জন্যই তিনি সংসারক্ষেত্রে সিদ্ধপুরুষ।

গ্রীশদেশের মনস্বী ডিমস্থিনিস্ তোত্‌লা হইয়াও অসামান্য বাগ্মিতা লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, কেন? উত্তর—তাঁহার অদম্য ইচ্ছা। তিনি প্রথমবারের বক্তৃতায় অকৃতকার্য্য, উপহসিত হইয়া শ্রেষ্ঠ বক্তা হইবার দুর্জ্জয় বাসনা মনে মনে পোষণ করিয়া নির্জ্জনে সাধনা করিতে লাগিলেন। সুদীর্ঘ সাধনার পর তাঁহার রসনায় বাগেদবীর অধিষ্ঠান হইল। তিনি বাগ্মিশ্রেষ্ঠ বলিয়া এথেন্সে, গ্রীসে, সমগ্র সভ্যসমাজে অদ্যাপি সম্মানিত। ইচ্ছার বলে প্রকৃতি পরাজিত, স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়বৈকল্য পরাহত।

ইংলণ্ডের জনহিতৈষী মহামনা জন্ হাউয়ার্ড জীবন বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন, কয়েদীদিগের দুঃখদুর্গতি দূর করিবার বলবতী বাসনা লইয়া।

রুষিয়ার সম্রাট্ মহাত্মা পিটার (Peter the Great) রুষজাতির প্রতিষ্ঠা অথবা জাতীয় জীবনে নবজীবন সঞ্চার করিতে পারিয়াছিলেন, প্রকৃত উন্নতির পথে প্রকৃতিপুঞ্জকে লইয়া যাইবার ইচ্ছা লইয়া। স্বরাজ্য মধ্যে য়ুরোপীয় সভ্যতা বিস্তার করিবার অভিপ্রায়ে রাজা হইয়া নিজে দূরদেশে জাহাজ নির্ম্মাণকার্য্য শিখিতে গিয়াছিলেন। ইচ্ছা করিয়া এত কায়িক ক্লেশ সহিয়াছিলেন, এত সামান্য, ক্ষুদ্র কর্ম্মে আপনাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহার ফলেই তিনি বড় হইয়াছেন, অমর হইয়াছেন।

বাবরের মৃত্যু একটী আশ্চর্য্য ঘটনা। হুমায়ুন যখন অত্যন্ত

কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, যখন তাঁহার জীবনের আশা ছিল না, তখন বাবর প্রিয়পুত্রের জীবন রক্ষার জন্য অতিশয় ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। পুত্রের আরোগ্য-ভাবনা তাঁহার মনকে ষোল আনা দখল করিয়া বসিল। তিনি তন্ময়চিত্তে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—প্রভো! আমার প্রাণ নিয়া পুত্রের প্রাণ রক্ষা কর, পুত্রকে বাঁচাইয়া দাও। ইহার পর হইতেই বাবর দিন দিন রুগ্ণ-দুর্ব্বল, হুমায়ুন সুস্থ-সবল হইতে লাগিলেন। অবশেষে বাবর অমরধামে চলিয়া গেলেন, হুমায়ুন বাঁচিয়া উঠিলেন। ইহার রহস্য কি? রহস্য—ইচ্ছাশক্তি (Will-force).

'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'। যে, যে রকম ভাবনা করে, তার সেই রকম সিদ্ধিলাভ হয়।

সরল আন্তরিক প্রার্থনা ভগবানের নিকট গিয়া পঁহুছে, ভক্তের এই কথা যে সত্য, তার প্রমাণ এই ঘটনায় আমরা স্পষ্ট দেখিতে পাই।

ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যুতেও ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না কি?

যে সকল মহামনা মানব ইতিহাসের পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়াছেন, যে সকল উন্নত পুরুষ মনুষ্যসমাজে বিচরণ করিয়া কৃতকৃত্য ও যশস্বী হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই উন্নত ও মঙ্গলইচ্ছা আজীবন পোষণ করিতেন। তদীয় কর্ম্মপরম্পরা ইচ্ছার মহিমা ঘোষণা করিয়া তাঁহাদিগকে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

মনুষ্যমাত্রই স্বীয় শক্তি ও রুচি অনুসারে ঈদৃশ যে কোন মহাশয় ব্যক্তির আদর্শে তদীয় সদিচ্ছার অনুকরণে সুদীর্ঘ সবল ইচ্ছা লইয়া

উন্নত হইতে পারে। পূর্ণব্রহ্ম পূর্ণআদর্শ হইলেও তাঁহাকে প্রত্যক্ষ আদর্শ ধরিতে পারে, এরূপ লোক জগতে বিরল। সাধারণ মানুষের আদর্শ—মানুষ। আমাদের মধ্যে আদর্শ-চরিত্রের নিতান্ত অভাব নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাদের অনুকরণ করিতে আমরা শিখি নাই। বিদ্যাসাগরকে কয়জন বাঙালী আদর্শ ধরিতে পারিয়াছেন?

সতী ভার্য্যার ন্যায় সদিচ্ছা আমাদের পরম হিতকারিণী। 'সতী নারীর পতি পর্ব্বতের চূড়া'। সতী, পতিকে অতি উচ্চ আসন দিয়া থাকেন। পতি দরিদ্র, অবিদ্বান্ যেরূপই হউক না কেন, অন্যে তাহাকে যেরূপই মনে করুন না কেন, সতীর কাছে তিনি দেবতা। সেইরূপ যিনি সতী-ইচ্ছার কর্ত্তা অর্থাৎ সর্ব্বদাই সৎ-ইচ্ছা পোষণ করেন, সেই ইচ্ছার মহিমায় তিনি নিশ্চয়ই উচ্চ আসনে সমাসীন থাকেন।

জাতিগত ও ব্যক্তিগত উন্নতির মূলে ইচ্ছার উন্নতি। ইচ্ছাকে দীর্ঘায়ত না করিলে আমরা খর্ব্ব হইয়াই থাকিব। ইহাকে বড় করিতে না পারিলে আমরা বড় হইতে পারিব না। চরিত্রকে গড়িয়া তোলা, জীবনকে পতিত-মলিন বা উন্নত-উজ্জ্বল করা, জ্ঞানী বা মূর্খ, মনুষ্য বা পশু, বদ্ধ বা মুক্ত হওয়া, আমাদের ইচ্ছাধীন। সুখ দুঃখ আমাদের চেষ্টাধীন। কিন্তু একথা কি সত্য? সুখ সকলেই চায়, কেহ দুঃখ চায় না, তবে কাহারও সুখ, কাহারও দুঃখ হয় কেন? ইহার উত্তর এই যে, সুখ চাহিয়া দুঃখ পায় যাহারা, তাহারা মুখে মুখে সুখ চায়, প্রাণের সহিত চায় না, তাহাদের ইচ্ছায় প্রাণ নাই। প্রাণহীন, মৃত ইচ্ছা কর্ম্ম জন্মাইতে পারে না, কর্ম্মাভাবে সুখাভাব, দুঃখ। জাতমাত্র মৃতসন্তানবৎ জাতমাত্র অপগত ইচ্ছা নিষ্ফল, দুঃখদায়ক।

কেহ কেহ হয়ত বলিবেন মানুষের সুখদুঃখ দৈবাধীন বা ঈশ্বরের ইচ্ছাধীন। 'উচল বলিয়ে অচলে চড়িনু, পড়িনু অগাধ জলে'। 'Man proposes, God disposes'. মানুষ ভাবে একরকম, হয় অন্যরকম, একে আর হয়। বাস্তবিক ইহা ভগবানের পরীক্ষা। সংসারে বার বার এরূপ পরীক্ষা হইয়া থাকে। প্রথম বারের পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হওয়াতে যদি ইচ্ছা চলিয়া যায়, তবে তাহা কোন ফল প্রসব করিতে পারে না। অবিচ্ছিন্ন ইচ্ছা লইয়া সকল কঠোর পরীক্ষায় অচলবৎ অটল থাকিলে, ভগবান্ অবশেষে মানুষের সে ইচ্ছা পূর্ণ করেন। তখন তিনি ও জগৎ সেই ইচ্ছার জয়দর্শনে বিস্মিত ও পুলকিত হইয়া থাকেন। অবশ্য আমরা দেখিতে পাই যে, 'হাতীরও পিছলে পাও, সুজনেরও ডোবে নাও'। দৈবাৎ হাতী পা পিছলাইয়া পড়িয়া যাইতে পারে, তা বলিয়া কি হাতী আর উঠিয়া চলিবে না? সুজনেরও নৌকা ডুবিতে পারে, আরব্ধ কর্ম্ম একবার পণ্ড হইতে পারে, তা হইলেই কি আর তিনি মহৎ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবেন না, আর কি তিনি নৌকা চালান দিবেন না? শিশু শত আছাড়-আঘাত পাইয়া হাটিতে শিখে। সংসারভূমে হাটিতে গেলেই আছাড়-আঘাত অনিবার্য্য।

একমাত্র চন্দ্র গগনে উদিত হইয়া নৈশ অন্ধকার দূর করে, শত শত তারা তাহা পারে না। অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইচ্ছা লইয়া মানুষ মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না, একটীমাত্র গগনস্পর্শী মহতী ইচ্ছার বলে তাহা পারে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইচ্ছা আমাদিগকে ক্ষুদ্রতাজালে আবদ্ধ রাখে।

আমরা ইচ্ছার অভাবে, অক্ষম, নিরুপায়। ইচ্ছা থাকিলেই উপায় হয়। "Where there is will, there is way"। একথা

আবালবৃদ্ধ ইংরেজিজ্ঞ সকলেই জানে, কিন্তু বলবতী স্থায়ী ইচ্ছাই আমাদের জন্মে না। আমাদের ইচ্ছা পারদের ন্যায় চঞ্চল; জল-বুদ্বুদের ন্যায় উঠে আর লয় পায়।

ক্ষুদ্র ইচ্ছা, শক্তি জন্মাইতে পারে না। আমাদের ইচ্ছাশক্তি ও ব্যক্তিত্বের অত্যন্ত অভাব দৃষ্ট হয়। ইচ্ছাশক্তিকে জাগ্রত করা একটা প্রধান কর্ম্ম। ইহা জাগিলে ব্যক্তিত্ব আপনিই ফুটিয়া উঠিবে।

'অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি'। শতবার ধৌত করিলেও অঙ্গারের কালিমা দূর হয় না। কু অভ্যাস একবার দৃঢ়মুল হইলে, শত চেষ্টায়ও তাহা দূর করা সুকঠিন হয়; সুতরাং শৈশব-কালে, বালক বালিকার মনে সৎ ও মহৎ ইচ্ছার বীজ পুষ্ট ও অঙ্কুরিত করা জনক-জননীর অবশ্যকর্ত্তব্য। উহাদিগের ইচ্ছাবৃত্তিকে সংযমিত রাখিতে হইবে, কিন্তু ইচ্ছার উচ্ছেদ করিতে হইবে না। প্রত্যুত যাহাতে মহৎ ও সুইচ্ছা উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাইতে পারে, তাহার সদুপায় বিধান করা আবশ্যক। এ দেশে সচরাচর লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়, 'কর্ম্মানুসারিণী বুদ্ধিঃ'। কর্ম্মেই বুদ্ধিকে চালায়, পূর্ব্ব-জন্মে যেরূপ কর্ম্ম করা হইয়াছে, তদনুসারেই এ জন্মে লোকের বুদ্ধি জন্মিয়া থাকে। যাহারা পূর্ব্বজন্ম মানেন না, তাঁহাদের একথায় আপত্তি আছে; কিন্তু ইচ্ছানুসারি কর্ম্ম, 'কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম' একথা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন।

যদি ইচ্ছাকে বরণ করিতে হয়, তবে বড় ইচ্ছাকেই বরণ করিব। ছোট ইচ্ছাকে কেন? যদি জন্তু শিকার করিতেই হয়, তবে হাতী শিকারই করিব। এ কার্য্যে যথেষ্ট পৌরুষ ও লাভ আছে। শত শত মাছি শিকারে কি ফল? মাছি মারিলে হাত কেবল কালই

হয়। এই পৃথিবীতে অনেক জ্ঞান ও সুখের ভাণ্ডার রহিয়াছে, তাহা অধিকার করিতে চেষ্টা করিব। অল্পজ্ঞানে, অল্পসুখে কেন সন্তুষ্ট থাকিব ?

ইচ্ছা বড় হইতে হইতে এতই বড় হইতে পারে যে, তখন আর এই জড়া পৃথিবী ইহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না, এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে ইহার স্থান হয় না ; তখন সে অনন্ত চিন্ময় রাজ্যে ছুটিয়া যায়। তখন পার্থিব রসে আর তাহার তৃপ্তি হয় না, অমৃতের অনুসন্ধানে ধায়।

অতৃপ্ত বাসনা লইয়া ঊর্দ্ধে অনন্তের পানে চাহিয়া যখন আমরা অনুভব করিতে পারিব—'ভূমৈব সুখং নাল্পে সুখমস্তি'। বড়তেই সুখ, অল্পে সুখ নাই, মহত্ত্বেই সুখ, ক্ষুদ্রতায় সুখ নাই। যখন বুঝিব, ভূমা ভগবান্ অনন্তসুখের উৎস, যখন আমাদের ক্ষুদ্র প্রাণ সেই প্রাণের প্রাণ, পূর্ণ মহান্‌কে সত্যসত্যই চাহিবে, তখন আমরা তাঁহারই কৃপায় অমৃতের অধিকারী হইব।

ইচ্ছাময় বিশ্বপতি আমাদিগকে ইচ্ছা দিয়াছেন এবং সেই ইচ্ছা তিনিই পূর্ণ করিয়া থাকেন। আমাদের ইচ্ছা বড় হউক, আমরা বড় হই, ইহা ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা। তাঁহার ইচ্ছা জয়যুক্ত হউক।

কি শিখিব ?

শিখিব আমরা ইচ্ছাশক্তিকে জাগাইতে। শিখিব আমরা ভগবানের ইচ্ছায় আমাদের ইচ্ছা মিলাইতে।

সত্য।

'সত্যং পরং ধীমহি'। (ভাগবত)

শক্তিং পরাং ধীমহি।

সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে ধ্যান করি।

শক্তিরূপিণী বিশ্বজননীকে ধ্যান করি।

কা'ল যেখানে ভীষণ-শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্যানী ছিল আজ সেখানে মনোহর উদ্যানশোভিত বহুজনসমাকীর্ণ হর্ম্ম্যময় মহানগরী বিরাজমান। পরশ্ব হয়ত সেই সুন্দরী মহাপুরীই মহাশ্মশানে পরিণত হইবে। ধনীর গর্ব্বিত সৌধচূড়া আঁখির পলকে ভূমিসাৎ, দরিদ্রের পর্ণকুটীর অগ্নিদাহে ভস্মসাৎ হইতে দেখা যায়। তুঙ্গ অভ্রভেদী শৈলশিখর কালে সাগর-গর্ভে লয় পায়। কদলী, ধান্য, সরিষা প্রভৃতি উদ্ভিদসকল পক্ক ফল শস্য প্রদান করিয়া ক্রমে অদৃশ্য হইয়া যায়। আজ যে শিশুর জন্মে গৃহ উৎসবময়, কা'ল তাহার মৃত্যুতে শ্মশানতুল্য নিরানন্দ! আজ পিতামাতা ভ্রাতা বনিতা প্রভৃতি পরিজন লইয়া সোণার সংসারে কত আনন্দোচ্ছ্বাস, কা'ল সেখানে প্রিয়জনবিরহে হাহাকার দীর্ঘশ্বাস! চন্দ্র-সূর্য্য, জলস্থল, তরুলতা, জড়জীব সকলেই দিন-দিন, পলে-পলে অনিবার্য্যরূপে পরিবর্ত্তিত হইতেছে।

জগতের প্রতি পদার্থেই অস্তি-নাস্তি, আছে-নাই এই দুই ভাব, সত্য-অসত্য এই বিরুদ্ধভাবদ্বয় বর্ত্তমান। কোন পদার্থই একান্ত সত্য

নহে। জাগতিক প্রত্যেক পদার্থেরই দুইটা দিক্। একটা সত্যের দিক্, আর একটা অসত্যের দিক্। এক হিসাবে সত্য, আর এক হিসাবে অসত্য। আজ যাহা দেখিতেছি, উপভোগ করিতেছি, দুদিন পরে আর তাহা নাই। প্রত্যক্ষ ও ভোগকালে সত্য। অপ্রত্যক্ষ ও বিলোপকালে অসত্য। যদিও বৈজ্ঞানিকের মতে বস্তুর অত্যন্ত ধ্বংস নাই, কেবল রূপান্তর আছে, তথাপি বর্ত্তমান দৃষ্টবস্তুর অভাবে আমরা অত্যন্ত-অভাব অনুভব করি। বৃক্ষকে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড কর, কাষ্ঠ কর, পোড়াইয়া ছাই কর, কিন্তু উহার পরমাণুর ধ্বংস নাই। পরমাণু-রূপে উহা জগতে থাকিয়া যাইবে। বৈজ্ঞানিকের এ হেন সিদ্ধান্ত সত্য হউক, কিন্তু বৃক্ষ নাই যে নাই-ই। আমরা বৃক্ষের ফলভোগে বঞ্চিত হইবই হইব।

জগতের প্রত্যেক পদার্থ ই ত সৎ-অসৎ, সত্য-অসত্য। কিন্তু এমন কি কোন বস্তু নাই, যাহা সম্পূর্ণ অপরিবর্ত্তনশীল, একাকার ও চির-সত্য ? মানবের মনে এই প্রকার প্রশ্নের উদয় হওয়া অস্বাভাবিক নহে। বহুপূর্ব্বে ভারতে ব্রহ্মবিদ্ ঋষিগণ আকুল প্রাণে এই প্রশ্নের সমাধান করিবার জন্য অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া দেখিলেন,—একমাত্র নিত্যসত্য পদার্থ আছেন, যিনি বিশ্বের স্পষ্টিস্থিতিলয়কারণ। যিনি জাগতিক সকল পদার্থে অনুপ্রবিষ্ট, জগৎ ছাড়িয়াও যাঁহার সত্তা রহিয়াছে। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, স্বপ্রকাশ, জীবের জ্ঞান-বুদ্ধি-দাতা।

একটীমাত্র সার সত্যে ঋষিগণ কি প্রকারে উপনীত হইলেন ? এ বিষয়ে কার্য্যকারণবাদই দার্শনিকের প্রধান যুক্তি। কার্য্য (Effect) থাকিলেই তাহার কারণ (Cause) থাকিবে। জগতের প্রতি পদার্থ জাত, উৎপত্তিশীল। সুতরাং প্রত্যেকেরই কারণ আছে। কার্য্য ধ্বংস

হইয়া কারণে লয় পায়। এক কারণ হইতে নানা কার্য্য হইতে পারে। মাটীর কলস, ঘট, হাঁড়ি, পুতুল এ সকলই কার্য্য, মৃত্তিকা কারণ। মৃত্তিকাই সত্য, এই কার্য্যগুলি ভাঙ্গিয়া গেলেও মৃত্তিকারূপে বর্ত্তমান থাকিবে। আবার, মৃত্তিকারও কারণ আছে। এই প্রকারে কারণের পর কারণ, তাহার কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে শেষ-কারণে উপনীত হওয়া যায়, যাহার আর কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কার্য্য মিথ্যা, কারণ সত্য, এই সিদ্ধান্ত অনুসারে চরম কারণই একমাত্র সত্য, আর যাবতীয় কারণই চরমকারণের কার্য্য, সুতরাং মিথ্যা। সেই চরম কারণ—চিন্ময়ী শক্তি বা ব্রহ্ম।

প্রাচীন আর্য্যসমাজ এই পরমসত্যকে সারাৎসার বলিয়া এবং সংসারটাকে অনিত্য বলিয়া বুঝিতেন ও ভাবিতেন। এই ভাব প্রাচীন হিন্দু-সভ্যতার একটী বিশেষত্ব। আধুনিক প্রতীচ্য সভ্যতার বিশেষত্ব, জড়ে অতিমাত্র আসক্তি, ইহার ফলে জড়বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি এবং সাংসারিক সুখভোগে একান্ত অনুরক্তি। হিন্দু সমাজের পক্ষে বর্ত্তমান সময়ে দুই দিক্ রক্ষা করিয়া অর্থাৎ পরমসত্যে ধ্রুব লক্ষ্য রাখিয়া সাংসারিক উন্নতি বিষয়ে অভিনিবেশ স্থাপন করিতে পারিলেই হিন্দুর বিশেষত্ব কথঞ্চিৎ অক্ষুন্ন থাকিতে পারে। পর-সত্যে স্থির লক্ষ্য রাখিতে না পারিলে, পৃথিবী মাধ্যাকর্ষণবলে আমাদিগকে সর্ব্বদা নীচে টানিয়া রাখিবে। পৃথিবীর ধূলি-মাটিতে কেবলই গড়াগড়ি ও হামা-গুড়ি দিতে থাকিলে আমরা স্বর্গসুখে বঞ্চিত হইব।

বৈজ্ঞানিক পরমার্থদৃষ্টিতে না হউক, লৌকিকদৃষ্টিতে সত্যনিষ্ঠ। লৌকিক বস্তুর তত্ত্বানুসন্ধান, গুণাগুণ পরীক্ষা ও বিচার বৈজ্ঞানিকের কার্য্য। মিথ্যা বা অবস্তু লইয়া তিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না।

পার্থিব সত্যই তাঁহার অবলম্বন। এই জন্যই বিজ্ঞানের জয়জয়কার। আমাদের মধ্যে প্রাচীন যুগের দার্শনিকতা নাই, বর্ত্তমানকালের বৈজ্ঞানিক গবেষণা নাই। আমরা কি লইয়া আছি? না পরমসত্য না লৌকিক সত্য; কোন সত্যই আমাদের উপাস্য নহে। সত্যের প্রতি আমাদের প্রাণের টান নাই। আমরা কেবল নকলেই সন্তুষ্ট! আহারে-বিহারে, আচারে-উপচারে, ভাবে-অভাবে, বেশ-ভূষায়, আচরণে-বচনে, গানে-জ্ঞানে সর্ব্বত্র নকল। আমাদের জীবন সকল বিষয়েই যেন নকলনবিশের জীবন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যিনি সত্যনিষ্ঠ, তিনি কখনই নকল-মেকিতে তুষ্ট থাকিতে পারেন না। কার্য্যে ও ভাবে সকল বিষয়ে সকল অবস্থায় সত্যই তাঁহার অবলম্বন। ধর্ম্মে ভাণ-ভণ্ডামি তাঁহার অসহ্য। আজকাল ধর্ম্ম ত 'সাত নকলে আসল খাস্ত'। একথায় নকল ধার্ম্মিকের ক্রোধ জন্মিতে পারে, কিন্তু প্রকৃত ধার্ম্মিক ধর্ম্মের এই শোচনীয় অবস্থা দর্শনে মর্ম্মাহত। আমরা দিন দিন যেন বামনাকৃতি হইতেছি, ধর্ম্মকেও তেমনি বামন-বিকল করিয়া তুলিয়াছি। ধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইলেও ধর্ম্মকলহ আছে, ধর্ম্মবণিক্ অনেক আছেন। ইহারা অধর্ম্মের দোকান সাজাইয়া, ধর্ম্মের নাম দিয়া, অধর্ম্ম বিক্রী করিতেছেন! গ্রাহকসংখ্যাও অল্প নহে। ইহা দ্বারা ধর্ম্মবণিক্‌গণ বিলক্ষণ লাভবান্ হইতেছেন। হায়! সত্যের মর্য্যাদা ধর্ম্মকর্ম্মেও রক্ষিত হইতেছে না!

আমি পণ্ডিত হইয়া উপদেশ দিতেছি,—'নাস্তি সত্যসমো ধর্ম্মঃ' যে মুখে যে মুহূর্ত্তে বলি সত্যের সমান ধর্ম্ম নাই, সে মুখে, পরমুহূর্ত্তে মিথ্যা বলিয়া রসনাকে কলঙ্কিত করিতে লজ্জা বোধ করি না। উপদেশ দিয়া থাকি,—'অশ্বমেধসহস্রাদ্ধি সত্যমেব বিশিষ্যতে'। সহস্র অশ্ব-

মেধযজ্ঞ আর সত্য তৌল করিলে সত্যের ভারই অধিক হইবে। 'সত্যে তিষ্ঠতি মেদিনী' সংসারটা সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত। সত্যের অভাবে সমাজ তিষ্ঠিতে পারে না, ধ্বংসের মুখে প্রবেশ করে। মিথ্যাকে লইয়া কোন জাতিই উন্নতিলাভ করিতে পারে নাই। 'অধর্ম্মের পত্নী মিথ্যা' একথা কল্কিপুরাণে আছে। অনৃতের সেবা করিলে অধর্ম্ম হয়। অধর্ম্মের ফল দুঃখ ও পরাজয়। এজগতে সত্যেরই জয়, সত্যের উপরই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। মিথ্যাপরায়ণ ধার্ম্মিক আর কাঁটালের আমসত্ত্ব একই কথা। সত্যের জন্য প্রাণ দিতে ধার্ম্মিক ব্যক্তি সর্ব্বদা প্রস্তুত। ইত্যাদি ভূরি ভূরি মূল্যবান্ উপদেশ পাইয়া থাকি ও দিয়া থাকি।

আবার, পাশ্চাত্য কবির কাব্য পড়িয়া বলি—

'Truth is the highest thing that man may keep',

(*Chaucer*)

মানুষের পক্ষে সত্যই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ জিনিষ। আর কিছু রক্ষা করিতে না পারিলেও একমাত্র সত্যরক্ষা করিলেই মানুষ, মানুষ বলিয়া পরিচিত হয়। সত্য চরিত্রের প্রধান উপাদান। কিন্তু বক্তা বা শ্রোতা আমরা কেহই যদি সত্যের মহিমা উপলব্ধি করিতে ও কার্য্যতঃ প্রদর্শন করিতে না পারি, তবে বক্তৃতা বন্ধ্যা স্ত্রীর ন্যায় নিষ্প্রসবা।

কোন সংস্কৃত কবি আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন ;—

'ধর্ম্মঃ প্রব্রজিতস্তপঃ প্রচলিতং সত্যঞ্চ দূরং গতম্।'

'ধর্ম্ম প্রস্থান করিয়াছে, তপস্যার লোপ হইয়াছে, সত্য দূরে চলিয়া গিয়াছে।' এখন ধর্ম্ম নাই, তপ নাই, সত্য নাই। কিন্তু এ সকল আমাদের একদিন ছিল। সত্যের জন্য প্রাণাধিক প্রিয়পুত্র রাম

চন্দ্রকে বনে পাঠাইয়া রাজা দশরথ নিজপ্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছিলেন। রামচন্দ্র পিতৃসত্য পালনার্থ পিতামাতা, রাজ্যসুখ, ঐশ্বর্য্য অম্লানবদনে পরিত্যাগ করিয়া বনবাসী হইয়াছিলেন। সত্যপ্রিয়তার এইরূপ অসংখ্য দৃষ্টান্ত প্রাচীন কাব্য-ইতিহাসে পাওয়া যায়। প্রাচীন আর্য্য-সমাজ সত্যকে সর্ব্বোত্তম বলিয়া গ্রহণ ও পালন করিতেন। কিন্তু আমরা এখন নানা বিষয়ে বহুদর্শিতা লাভ করিয়া সত্যভ্রষ্ট হইয়াছি।

লোকে মিথ্যা বলে কেন? শিশু সত্যকে ভালবাসে, সরল সত্যে তাহার উলঙ্গ প্রাণ নাচিয়া উঠে। ফলাফল, হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া শিশু সত্যকথাই বলিয়া থাকে। কিন্তু বড় হইলে মিথ্যাবাদী হয় কেন? ইহার উত্তর—শিক্ষার দোষেই এরূপ হইয়া থাকে। পিতামাতা সন্তানকে যদি মিথ্যার সমুচিত শাসন, ও সত্যের যথোচিত পুরস্কার না করেন, তবে সন্তান মিথ্যায় অভ্যস্ত হইতে থাকে। বালক অন্যায় করিয়া তাহা স্বীকার করিলে যদি শাস্তি পায়, ও মিথ্যা বলিয়া যদি অব্যাহতি পায়, তবে সে মিথ্যা বলিবে। বালকদিগের মনে মিথ্যার প্রতি বিদ্বেষ ও সত্যের প্রতি অনুরাগ জন্মান একান্ত কর্ত্তব্য। অভিভাবকেরা যদি সত্যের আদর না করিয়া উদাসীন থাকেন, সত্য-কথা বলার দরুণ যদি বালক দণ্ডিত হয়, তবে কেন সে সত্য বলিবে? বালক যত বড় হইতে থাকে, ততই চতুর্দ্দিকের মিথ্যা ব্যবহার দেখিয়া মিথ্যার পুরস্কার বা দণ্ডাভাব দেখিয়া, সত্যের প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন করে। সে দেখে, মুখে উপদেশ এক রকম, কার্য্য আর এক রকম, পুস্তকের নীতিবাক্য পুস্তকে ও মুখেই থাকে। তারপর সংসারে প্রবেশ করিয়াও কুটিল মিথ্যাচার দেখে।

সেইরূপ, সমাজ যদি মিথ্যার তীব্র তিরস্কার, সত্যের সমুচিত

পুরস্কার না করে, তবে সাধারণ লোকের মনের গতি মিথ্যার দিকেই হইবে, আশ্চর্য্য নয়। যে সমাজ যত দুর্ব্বল, সমাজ-বন্ধন যত শিথিল, সে সমাজে সত্যানুরাগ তত ক্ষীণ। যাবতীয় জঘন্য পাপের মধ্যে মিথ্যাকথন জঘন্যতম। কিন্তু কোন দিন কিছু চুরি বা অন্য পাপ করেন নাই, এমন লোক অনেক থাকিতে পারেন, অথচ জীবনে একটী মিথ্যা-কথাও বলেন নাই, এরূপ লোকের সংখ্যা বোধ হয় অতি অল্প। শাস্তির ভয়ে যে ব্যক্তি সত্যকথা বলিতে বিরত থাকে, সে নিশ্চয়ই ভীরু, কাপুরুষ। স্বার্থের খাতিরে যে মিথ্যা কপট ব্যবহার করে, তাহার চিত্ত দুর্ব্বল, ক্ষুদ্র। মানসিক ভীরুতা ও দুর্ব্বলতা মিথ্যা-ভাষণের অন্যতম কারণ। পক্ষান্তরে, সত্যপালনে চিত্তের দৃঢ়তা ও সবলতা প্রকাশ পায়। ইহাতে যে পুরুষত্বের আবশ্যক, তাহার অভাব হইলে সমাজমধ্যে মিথ্যা প্রশ্রয় পাইয়া থাকে।

'মরদ্‌কা বাত্‌, হাতীকা দাঁত্‌'। হাতীর দাঁত ও পুরুষের বাক্য উভয়ই তুল্য। দাঁত একবার বাহির হইলে, হাতী আর তাহা ফিরাইয়া ভিতরে নিতে পারে না। যিনি মরদ অর্থাৎ পুরুষ, তাঁহার মুখ হইতে একবার যে কথাটা বাহির হয়, তাহার অন্যথা তিনি করিতে পারেন না। তাঁহার যেই কথা, সেই কাজ। কার্য্যে পরিণত হইলেই বাক্য হস্তিদন্তের ন্যায় শুভ্র-শোভন, মূল্যবান্! হাতীর সহিত পুরুষের তুলনা। হাতীর গায়ে যত বল, মানুষের মনে সেই বল থাকিলে, তাঁহার সকল কথাই কার্য্যে পরিণত হইতে পারে।

পুরাকালে কার্থেজ ও রোমবাসীদের মধ্যে বহুবর্ষব্যাপী যুদ্ধ চলিতেছিল। একযুদ্ধে কার্থেজসৈন্য একদল রোমকসৈন্যকে পরাজিত করিয়া সেনাপতি রেগুলাসকে (Regulus) বন্দী করিয়া লইয়া যায়।

কিন্তু অন্যান্য অনেক যুদ্ধেই কার্থেজীয়গণ পরাভূত হইতে থাকে। ইহাতে তাহারা সন্ধির প্রস্তাব করিয়া রোমে দূত প্রেরণ করে। এবিষয়ে অনেকটা আনুকূল্য হইবে আশা করিয়া সেই সঙ্গে রেগুলাস-কেও পাঠায়। তাঁহাকে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতে হইয়াছিল যে, যদি সন্ধি না হয়, তবে তিনি কার্থেজে ফিরিয়া যাইবেন। দূত সহ রেগুলাস রোমে উপস্থিত হইয়া তত্রত্য সিনেট সভার নিকট নিজের স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে অনুমতি পাইয়া বলিলেন—'কার্থেজ নানা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া হীনবল হইয়াছে, এ অবস্থায় সন্ধি করিলে রোমের বিশেষ ক্ষতি। সন্ধি না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। সুতরাং সন্ধি হইল না। বাড়ী-ঘর, স্ত্রী-পুত্র, সকলের মায়া মমতা পরিত্যাগ করিয়া রেগুলাস কার্থেজে বন্দী-ভাবে ফিরিয়া গেলেন। ইচ্ছা করিলে তিনি দেশে থাকিতে পারিতেন, কিন্তু প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিলেন না। তিনি অনুরোধ করিলে সন্ধি হইত, নিজেও মুক্তিলাভ করিতে পারিতেন, কিন্তু সমাজের বিরাট স্বার্থের নিকট নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থ অতি তুচ্ছ মনে করিয়া যুদ্ধ চালাইতে স্বদেশবাসীদিগকে পরামর্শ দিয়াছিলেন। ইহার ফলে তিনি শত্রুহস্তে ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইয়াছিলেন। ধন্য রেগুলাস। ধন্য তাঁহার স্বদেশপ্রেম! ধন্য তাঁহার সত্যনিষ্ঠা!

অতি সামান্য বিষয়েও অঙ্গীকার করিলে মহাত্মারা তাহা পালন করিতে বিস্মৃত হন না।

নেপোলিয়ন বোনাপার্টি কোন এক সামরিক বিদ্যালয়ে পড়িতেন। সেইখানে একটী স্ত্রীলোক ফল বেচিত। তাহার নিকট হইতে নেপোলিয়ন প্রায়ই ফল কিনিয়া খাইতেন। কখন কখন ধার থাকিত। তিনি স্কুল ছাড়িবার সময় এই স্ত্রীলোকটীর সমস্ত পাওনা শোধ করিয়া

দিতে না পারিয়া তাহাকে বলিলেন—কয়েক আনা পাওনা রহিল, যখন পারি দিব।

অনেক বৎসর পর একদিন নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সম্রাট্ হইয়া সেই স্কুল পরিদর্শন করিতে গেলেন। ফলওয়ালীর পাওনার কথা তাঁহার মনে আছে। তিনি সন্ধ্যার পর নিজে ফলওয়ালীর বাড়ী যাইয়া আগের মত নূতন ফল চাহিয়া খাইলেন এবং প্রচুর অর্থ দিয়া বৃদ্ধাকে পরিতুষ্ট করিলেন।

যাহারা অলস অকর্ম্মা, হাত পা গুটাইয়া বসিয়া থাকে, তাহাদের মুখটা খুব চলে। তাহারা মুখে মুখে হাতী মারে, বাঘ মারে, কেল্লা ফতে করে। তাহাদের কথা কেহ বিশ্বাস করে না, তাহারা গুলি-খোরের আড্ডায় স্থান পাইবার যোগ্য। কিন্তু যাঁহারা কাজের লোক, তাঁহারা বাক্যবীর নহেন। সর্ব্বদাই কর্ম্মে ব্যস্ত, বেশী কথা বলিবার অবসর পান না; সুতরাং মিথ্যা বলিবার সুযোগ তাহাদের অল্পই ঘটে।

ক্ষুদ্রমনা বিষয়ীলোক ক্ষুদ্র দোকানদারী বুদ্ধি লইয়া কেবল ঐহিক লাভ ক্ষতি গণনা করে। ধর্ম্ম চুলোয় যাক্, লোকের বিশ্বাস যায় যাক্, দুটা মিথ্যা বলিয়া যদি দুইটা পয়সা পাওয়া যায়, তাহাই লাভ। কিন্তু আশুলাভ হইলেও পরিণামে যে কি ক্ষতি সে কথা ভাবে না। বিশ্বাস করে না যে, সত্যই শক্তি, সত্যই মঙ্গল, সত্যই সুন্দর। লোক-ব্যবহারে, ব্যবসা-বাণিজ্যে "Honesty is the best policy" সততাই সর্ব্বোত্তম নীতি, একথা কৃষ্ণপান্তী ও রামদুলাল সরকার কার্য্যদ্বারা বিশেষ ভাবে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই ইংরাজী বাক্যটী বোধ হয় তাঁহারা জানিতেন না।

রাণাঘাটের তিলীবংশীয় কৃষ্ণপান্তী প্রথম অবস্থায় অতি দরিদ্র

ছিলেন। লেখাপড়া শিখেন নাই। মাথায় মোট বহিয়া পান বেচিয়া কষ্টে জীবিকানির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু সততার গুণে, ব্যবসায়ে ক্রমে উন্নতি লাভ করিয়া বঙ্গদেশের মধ্যে প্রসিদ্ধ ধনী হইয়া অনেক জমীদারী ক্রয় করেন। তিনি একমুখে দুইকথা বলিতে জানিতেন না। ছোট বড়, ভদ্রাভদ্র সকলেই তাঁহাকে যুধিষ্ঠিরের ন্যায় সত্যবাদী বলিয়া বিশ্বাস করিত। কথিত আছে, একবার তিনি কলিকাতা হইতে বাড়ী যাইতেছিলেন, এমন সময় পথে কয়েকজন ডাকাইত তাঁহাকে আক্রমণ করে। ডাকাইতেরা নৌকাতে টাকা পয়সা না পাওয়াতে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। কৃষ্ণপান্তী তাহাদিগকে বলিলেন—আমার গদিতে গেলে তোমাদিগকে অনেক টাকা দিব। তোমরা আমার গদিতে যাইও। ডাকাইতেরা তখন তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিয়া চলিয়া গেল এবং এক দিন তাঁহার গদিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি তাহাদিগকে প্রচুর অর্থ দিয়া বিদায় করিলেন। বিশ্বাস বড় জিনিষ।

'বাংলার রথচাইল্ড' (Rothchild) রামদুলাল সরকার বাল্যকালে অতি দীন দরিদ্র ছিলেন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী ৺ মদনমোহন দত্তের বাড়িতে প্রতিপালিত হইয়া ৫৲ পাঁচ টাকা বেতনে তাঁহার অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। শেষে আরও ৫৲ পাঁচ টাকা বেতন বৃদ্ধি হয়। একদিন মদনমোহন চৌদ্দহাজার টাকা দিয়া একটী নীলাম ডাকিবার জন্য তাঁহাকে পাঠাইয়া দেন। রামদুলাল নীলাম স্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন ডাক হইয়া গিয়াছে। তারপর গঙ্গায় জলমগ্ন একখানি জাহাজ চৌদ্দহাজার টাকায় নীলাম ডাকিয়া লইলেন এবং একলক্ষ চৌদ্দহাজার টাকায় বেচিলেন। তিনি ঐ টাকা লইয়া প্রভুর নিকট আসিলেন। এবং সকল কথা সরল ভাবে ব্যক্ত করিয়া

সমস্ত টাকা প্রভুকে দিলেন। সামান্য বেতনভোগী ভৃত্যের সততা ও নির্লোভ ব্যবহার দেখিয়া মদনমোহন বিস্মিত হইলেন। তিনি নিজের চৌদ্দহাজার টাকা গণিয়া রাখিয়া বাকি একলক্ষ টাকা রামদুলালকে দিয়া বলিলেন—'এই টাকা তোমার প্রাপ্য। তোমার সততার পুরস্কার'। ধন্য মনিব, ধন্য চাকর!

এখন হইতে রামদুলাল স্বাধীনভাবে ব্যবসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সততার ফলে ক্রমেই উন্নতি হইতে লাগিল। তিনি কয়েক খানি জাহাজ কিনিলেন ও আমেরিকার সহিত বাণিজ্য আরম্ভ করিলেন। এই প্রকারে তাঁহার বিস্তর লাভ হইতে লাগিল। তিনি বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া অসংখ্য দান করিয়া এক কোটীর অধিক টাকার সম্পত্তি রাখিয়া পরলোকে গমন করেন।

সাধু শব্দের এক অর্থ বণিক বা সদাগর। পূর্ব্বে বণিক্‌দিগের নামের সঙ্গে সাধু শব্দ যোজিত হইত। আজকাল আমরা ব্যবসায়ীদিগকে যদি তদীয় কার্য্য দ্বারা সাধু বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি, তবে সমাজের প্রভূত উপকার হইবে। আগে বিনা খতে; বিনা সাক্ষীতে, নিরক্ষর নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগকেও অনেক সময় টাকা ধার দেওয়া হইত। ইহারাও কথামত সুদ সহ যথাসময়ে টাকা শোধ দিত। মুখের কথায় হাজার হাজার টাকার কাজ হইত, কারবার চলিত। প্রায় কেহই বিশ্বাস বা সত্য ভঙ্গ করিত না। কিন্তু 'তে হি নো দবসা গতাঃ'। সেই দিন আমাদের চলিয়া গিয়াছে। এখন আর কেহ কাহাকে বিশ্বাস করিতে চায় না। আমরা নিজেকেই নিজে বিশ্বাস করিতে পারি না। কেন এমন হইল?

ভগবানের প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস, ধর্ম্মভয় চলিয়া গেলে বা কমিতে

থাকিলে সমাজ লৌকিক সত্যে অবহেলা করিয়া অধোগামী হয়। অবিশ্বাসের ফলে, ভাণ-ভণ্ডামি, ছল-চাতুরি প্রভৃতি মিথ্যার যত প্রকার ভেদ আছে, সব গুলি একত্রে আসিয়া সমাজকে কলঙ্কিত করে। মিথ্যাবলা ত মুখের দুই চারিটা কথা বই আর কিছুই নয়? এইজন্য আর কয়টা লোক শাস্তি পায়! বস্তুতঃ চুরি প্রভৃতি অপরাধে অপরাধী যেমন প্রায়ই রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়া শাস্তি পায়, মিথ্যাবাদীর নামে বিচারালয়ে সেইরূপ নালিশও হয় না, দণ্ডও হয় না, সুতরাং অবিশ্বাসী হীনচিত্ত ব্যক্তি মিথ্যা বলিতে সাহস পায় এবং স্বার্থ-হানির ভয়ে সত্য বলিতে ভীত হয়। এখানকার বিচারালয়ে শাস্তি না পাইলেও যিনি বিশ্বতশ্চক্ষু, বিশ্বতঃশ্রোত্র, যিনি সব দেখেন, সব শোনেন, সব জানেন, সেই রাজরাজেশ্বরের বিচারালয়ে একদিন পাপের বিচার হইবে। এইরূপ সরল বিশ্বাস যাহার আছে সে কি মিথ্যা বলিতে পারে?

সত্যপালন করিতে যে বলের প্রয়োজন, শক্তিরূপী বিশ্বপিতার নিকট সেই বললাভের জন্য সত্যসত্যই যদি সরল প্রাণে প্রার্থনা করি, তবে তিনি প্রসন্ন হইয়া আমাদিগকে অভীষ্ট বরদান করিবেন। তাঁহার বরে আমরা সত্যরত হইয়া শক্তিশালী হইব। সত্য আমাদের ধ্যানের বিষয়, শক্তি আমাদের সাধনার বিষয় হইবে।

কি শিখিব?

শিখিব আমরা সত্যের সেবা করিতে। শিখিব আমরা সত্যরূপী শিবময় সুন্দর পুরুষকে ধ্যান করিতে।

একতা।

নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশিষ্ট, বহুশিরাজালবেষ্টিত মানবশরীরের একটা সামান্য একত্ব বোধ প্রত্যেক মানবেরই আছে, কিন্তু বিশেষ জ্ঞান অজ্ঞের নাই। আমার মাথা, আমার হাত, আমার পা, এই জ্ঞান সকলেরই আছে, কিন্তু শরীরযন্ত্রের ক্রিয়া কোথায় কি ভাবে হইতেছে, ইহাকে দীর্ঘ কাল কি উপায়ে সবল রাখা যায়, বিকল হইলেই বা কি উপায়ে সংস্কার সম্ভবে ইত্যাদি জ্ঞান বিশেষজ্ঞেরই আছে, অল্পজ্ঞের নাই। পণ্ডিতের দৃষ্টান্তানুসরণে মূর্খ, স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়ম পালন করিয়া দেহ সুস্থ রাখিতে পারে। সেইরূপ সমাজরূপী বিরাটপুরুষের মস্তিষ্কস্থানীয় যাঁহারা, যাঁহারা বিদ্বান্, তাঁহারা সমাজ-শরীরটাকে নিয়ন্ত্রিত, সবল-সচল রাখিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিরই একটা সাধারণ জ্ঞান থাকা উচিত যে, এই সমাজ আমার, একের দুঃখে ও সুখে আমার দুঃখ ও সুখ, একের উন্নতি ও অবনতিতে আমার উন্নতি ও অবনতি। এই ভাবটা যখন আপামর সর্ব্ব সাধারণের সাধারণ হইয়া দাঁড়ায়, তখনই সমাজের প্রতি, তাহাদের একটা প্রাণের টান আসিতে পারে, অন্যথা নহে। তখনই একতা লাভের সম্ভাবনা।

বঙ্গসমাজে অজ্ঞের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। কৃষক প্রভৃতি নিরক্ষর লোকের এইরূপ ভাব মনে জাগে না। অথচ ইহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া শিক্ষিত দলের একতার প্রয়াস সম্প্রদায়-সৃষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। সর্ব্ব সাধারণের এই প্রকার একটা সাধারণ জ্ঞান জন্মাইয়া

দেওয়া বিনা শিক্ষায় অসম্ভব। এই জ্ঞানকে স্বাভাবিক করিতে হইলে সৎ দৃষ্টান্তের প্রয়োজন। অজ্ঞকে জ্ঞান দানই বিজ্ঞের লক্ষণ, অবজ্ঞা করা বিজ্ঞের লক্ষণ নহে। মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের বলে যাঁহারা বলীয়ান্, তাঁহারা বোঝেন, প্রত্যেকেই বিরাট পুরুষের এক একটি অঙ্গ, বোঝেন একটি কেশ, একটি রোমের জন্মও নিরর্থক নহে। কৃষক, চণ্ডাল, ডোম সকলেই বিরাট পুরুষের অংশভূত, সকলেই সমাজের প্রয়োজন সাধন করিতেছে। হস্ত না থাকিলে আহার্য্য বস্তু মুখে দেওয়া যায় না, চরণ না থাকিলে চলা যায় না, নখ না থাকিলে কণ্ডূয়নাদি কার্য্য নির্ব্বাহ হয় না। কৃষককুলের অভাবে অন্ন পাওয়া অসম্ভব, তাঁতি-কুলের অনুন্নতিতে বস্ত্র পাওয়া কঠিন, এ সকল কথা বিজ্ঞেরা বিলক্ষণ বোঝেন, কিন্তু মূর্খের সে জ্ঞান নাই।

একত্ব সাধন পক্ষে জ্ঞান প্রথম সাধন। দ্বিতীয় উপায় অনুভূতি। মস্তিষ্ক ও হৃদয়, জ্ঞান ও প্রেম, উভয়েরই প্রয়োজন। মস্তিষ্ক বোঝে, হৃদয় আলিঙ্গন করে। জ্ঞান বিচার করে; প্রেম, পরকে আপনার করিয়া কোলে লয়। মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের সংযোগে, জ্ঞান ও প্রেমের শুভ সম্মিলনে একত্বের দিব্যস্ফুরণ হইয়া থাকে। আগে একত্ববোধ, পরে একত্বের তীব্র অনুভূতি না জন্মিলে প্রকৃত একতা জন্মিতে পারে না। মানবশরীরে মস্তক, পদ প্রভৃতির একটা সামঞ্জস্য রাখিয়া নির্ব্বিবাদে যথোপযুক্ত পরিচালনা দ্বারা যেমন স্বাস্থ্যোন্নতি সাধন হয়, সেইরূপ সমাজ-শরীরের সকল অঙ্গ, সকল শ্রেণীর লোক নির্ব্বিরোধে উন্নতির দিকে ধাবিত হইলেই সমাজের উন্নতি ও কল্যাণ।

একতাই বল, অনৈক্য দুর্ব্বলতা, সকলে এক হও ইত্যাদি একতার ভূয়সী প্রশংসা ও উপদেশ বহু গ্রন্থে বহু প্রবন্ধে, বহু বক্তৃতায়

দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয়, একতার পরিবর্ত্তে ঘোরতর অনৈক্যের প্রসার বৃদ্ধি পাইতেছে! বর্ত্তমান নব্য শিক্ষিত-দিগের মধ্যে অনেকেই "নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্" এই ভাব প্রকাশ্য বা প্রচ্ছন্ন ভাবে হৃদয়ে পোষণ করিয়া থাকেন। সমাজের বার আনা লোক—যাহারা অশিক্ষিত, তাহাদের সঙ্গে কোনরূপ সংস্রব রাখিতে ইহাঁরা চান না। ইহাঁরা স্বতন্ত্র। এই বিচ্ছেদ ক্রমশঃই বাড়িয়া যাইতেছে। ইহাঁরা অজ্ঞের সহানুভূতি পান না। ইহাঁদের মুখে কিন্তু কখন কখন প্রয়োজনবশতঃ ঐক্যের মধুর কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু,

মুখে দুটো মিঠে কথা কহিলে কি হয়?
মনে যদি মিঠে ভাব নাহি তব রয়?

মনের মিল না থাকিলে, হৃদয় এক না হইলে, বাহিরে মৌখিক বা বাচনিক একতা কোন কাজে আসে না।

প্রত্যেক মানুষের মুখাবয়ব যেমন বিভিন্ন, মনও তেমনি ভিন্ন-ভাবাপন্ন; তবে ঐক্যের আশা কোথায়? জ্ঞান ও প্রেমের শিক্ষা ভিন্ন, ভিন্ন ভিন্ন মন গুলিকে এক করা অসম্ভব। উহাদিগকে এক ছাঁচে গড়িয়া না তুলিলে প্রকৃত একতা অলীক বাক্য।

বঙ্গসমাজে একতা শ্রুতিগোচরে ও অভিধানে বর্ত্তমান, কিন্তু কার্য্যতঃ লোপ পাইয়াছে। ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া শিক্ষিতে অশিক্ষিতে, শিক্ষিতে শিক্ষিতে, নিরক্ষরে নিরক্ষরে অনৈক্য। ধনী নির্ধনে, ধনবানে ধনবানে, দরিদ্রে দরিদ্রে অনৈক্য। আমরা আমাদের মহান্ জাতীয় স্বার্থ বুঝি না, বুঝিলেও কার্য্যকালে ভুলিয়া যাই। মুখে ঐক্যের ভাণ, অন্তরে বিষম অনৈক্য। সামান্য কাল্পনিক স্বার্থের সংঘর্ষে ভয়ঙ্কর

বিদ্বেষবহ্নি জ্বলিয়া উঠে। ইহার মূলে প্রেমের অভাব। বাঙালী বাঙালীকে আপনার জন বলিয়া ভাবিতে শিখে নাই, ভালবাসিতে শিখে নাই। এই টুকু শিখা চাই। প্রত্যেক বঙ্গবাসী আমার, আমি প্রত্যেক বঙ্গবাসীর, এই ভাবটা সকলের মনে জাগিলে শিক্ষা চরিতার্থতা লাভ করিতে পারে।

মৌলবীসাহেব উপদেশ দিয়া থাকেন—

আগর্ ফির্দউস্ বর্ রূয়ে জমীনাস্ত্।
হমিন্আস্তো হমিন্আস্তো হমিন্আস্তো।

অর্থাৎ যদি পৃথিবীতে স্বর্গ থাকে, তবে এইখানে আছে, এইখানে আছে, এইখানে আছে। কবি যে স্থানকে লক্ষ্য করিয়াই কবিতাটী লিখুন না কেন, আমরা বলি, যদি পৃথিবীতে স্বর্গ থাকে, তবে জন্মভূমিই স্বর্গ, জন্মভূমিই স্বর্গ, জন্মভূমিই স্বর্গ। জন্মভূমির ন্যায় পুণ্য মনোরম স্থান জগতে আর কোথায় আছে? ভাই হিন্দু! ভাই মুসলমান! তোমরা সকলে স্বর্গীয়প্রেমে আবদ্ধ হইয়া বঙ্গভূমিকে ফির্দউস্ (Paradise) করিয়া তোল।

মাষ্টার মহাশয়, কবি লে হাণ্ট (Leigh Hunt) এর 'আবুবিন' (Abu Bin Adhem) কবিতাটী ব্যাখ্যা করিয়া ছাত্রদিগকে বুঝাইয়া বলেন—প্রেমময়ের প্রিয়তম তিনি, যিনি মানবের প্রতি প্রেমবান্। যিনি সকল মানুষকে ভালবাসেন, ভাই ভাই বলিয়া কোলে নিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত ভগবদ্ভক্ত।

'তৃণৈ গুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ।' তৃণরাশি রজ্জু হয়ে, বাঁধে মত্ত গজ। পণ্ডিত মহাশয় হিতোপদেশের এই উপমাটী লইয়া বুঝাইয়া থাকেন—একটী তৃণের দ্বারা কোন কাজই হয় না। তৃণ

অসংখ্য হইলেও পৃথক্ পৃথক্ থাকিলে, কোন কাজ হয় না। কিন্তু যখন উহাদিগকে লইয়া রজ্জু তৈয়ার করা যায়, তখন রজ্জুতে পরিণত সেই তৃণরাশিদ্বারা মদমত্ত হস্তীকেও বাঁধা যায়। দেখ, একতার বল কত! তোমরা তৃণের মত হেয়-হীন হইলেও একতার বলে বড় বড় কাজ অনায়াসে সম্পন্ন করিতে পারিবে। একজনের পক্ষে যাহা অসম্ভব দশজনের শক্তি একত্র হইলে তাহা সুসাধ্য।

এই সকল কথা শুনিতে বড়ই মধুর, বড়ই উত্তম, কিন্তু ফল বড় কিছু হইতেছে না। কারণ, লোকের হৃদয় হইতে প্রেম চলিয়া যাইতেছে, কাম সেই স্থান দখল করিতেছে। ভ্রাতৃপ্রেম ভ্রাতৃপ্রেম বলিয়া চীৎকার করিলে কি হইবে? দেহে রোগ জন্মাইয়া, ঔষধ না খাইয়া, ঔষধের নাম স্মরণ করিলে কি ফল? যে আপন ভাইকে ভালবাসিতে জানে না, সে পরের ভাইকে কেমন করিয়া ভালবাসিবে? যদি ভালবাসে, তবে সে ভালবাসা কৃত্রিম। যে সমাজে সোদরে সোদরে মতান্তর, মনান্তর, পিতাপুত্রে অনৈক্য-অপ্রীতি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে; গর্ভধারিণীকে চোখের জলে ভাসাইয়া, ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই হইয়া পড়িতেছে, সেখানে স্বদেশপ্রেম কথামাত্রে পর্য্যবসিত। স্বদেশপ্রেম পরিজনপ্রেমের বিরাট সম্প্রসারণ। পরিবারস্থ সকলকে ভালবাসিতে, গুরুজনকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতে না শিখিলে প্রতিবেশী, গ্রামবাসী ও স্বদেশবাসীর প্রতি প্রেম জন্মিতে পারে না।

একদিন শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে বলিলেন—বল দেখি ভাই, প্রকৃত বল কিসে হয়? ভুজবলদৃপ্ত লক্ষ্মণ উত্তর করিলেন—'বলং বলং বাহুবলম্'। বাহুবলই বল। প্রেমাবতার বীর রামচন্দ্র বলিলেন—

না, তা নয়; 'বলং বলং ভ্রাতৃবলম্'। ভ্রাতৃবলই বল। কাহার কথা সত্য? আমরা কাহার কথা উপেক্ষা করিতে পারি না।

সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তিরই যেমন একটা ব্যক্তিত্ব-স্বাতন্ত্র্য থাকা আবশ্যক, তেমনি সকলের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব-একত্ব থাকা দরকার। বাহুবলের সহিত যুক্ত ভ্রাতৃবল সোণায় সোহাগা। বাহুবলের অভাবে পদে পদে দুঃখ নিগ্রহ। ভ্রাতৃবলের অভাবে আত্মদ্রোহ, স্বজাতিকলহ। লক্ষ্মণ বাহুবলের পক্ষপাতী হইলেও তাঁহার ভ্রাতৃপ্রেম জগতে অতুলনীয়। তিনি স্ব-ইচ্ছায় কেবল ভ্রাতৃপ্রেমের অনুরোধে সর্ব্বত্যাগী, বনবাসী হইয়াছিলেন। এমন ত্যাগস্বীকার কে আর কোথায় দেখেছে? রামচন্দ্র বীরের বীর মহাবীর হইয়াও ভ্রাতৃভক্তিতে বিমুগ্ধ, ভ্রাতৃগতপ্রাণ। কিন্তু রামলক্ষ্মণের চরিত্র এখন আর আমাদিকে ভ্রাতৃপ্রেম শিক্ষা দিতে পারে না! এখন আর এ সমাজে দাদা রাম, ভাই লক্ষ্মণ জন্মে না! হায়! ভ্রাতৃপ্রেমের আদর্শ আমাদের কাছে, কে ধরিবে?

ভারতবাসীর বহির্দৃষ্টি নাই, অন্তর্দৃষ্টি আছে, একথা অনেকের মুখে শুনা যায়। 'আছে' না বলিয়া, 'ছিল' বলাই সঙ্গত। এখন অন্তর্দৃষ্টি চলিয়া গিয়াছে, বাহিরের দৃষ্টিও আশানুরূপ প্রসারিত হয় নাই। বাহির আমাদের ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র আমাদের ভিতর। অন্তর্দৃষ্টি যদি থাকিত, তবে প্রেমের এত অভাব হইত না।

ভালবাসার কেন্দ্রস্থল 'আমি'। মানুষ 'আমি'কে যত ভালবাসে, এমন আর কাহাকেও নয়। আমি স্ত্রীকে ভালবাসি কেন? স্ত্রী আমার। পুত্রকন্যাকে ভালবাসি কেন? পুত্র আমার, কন্যা আমার। পুত্র অতি কুৎসিত, তবু সুন্দর দেখি! পরের হইলে, সুন্দর দেখিতাম না, ভালবাসিতাম না। তবেই ভালবাসার মূল-

প্রস্রবণ 'আমি'। আমার এই অল্প কয়েকজন লইয়া আমি কত সুখী! এই 'আমি' ও 'আমার' যত বাড়ে, ততই সুখের মাত্রাও বাড়ে। বৃহৎ 'আমি' অতি বলবান্। ক্ষুদ্র 'আমি' নিরুপায়। বঙ্গের পুরুষগণ আমার ভাই, রমণীগণ আমার ভগিনী। ইহাদিগকে লইয়া এক অতি বিপুল পরিবার গড়িতে পারিলে, না জানি কতই বল, কতই সুখ! আমরা বাল্যকাল হইতে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে শিখিব—

Older, older as I grow,
Brighter, brighter light may glow ;
Country, Continent and the earth,
Be my happy home and hearth.

বয়োবৃদ্ধির সহিত আমার মনে জ্ঞানালোক উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর হউক। দেশ, মহাদেশ, নিখিল ভুবন আমার প্রিয় ভবন হউক। বাল্যকাল হইতে ভগবানের নিকট এই প্রকার প্রার্থনা ও শিক্ষার ফলে জ্ঞান ও প্রেম বাড়িতে বাড়িতে 'বসুধৈব কুটুম্বকম্', বিশ্বজনকে আপনার জন করিয়া লইতে পারিলে, বিরাটপুরুষের পূজা সম্পূর্ণ হয়। এইরূপে 'আমি' মহামানব-সমুদ্রে ডুবিয়া গেলে, সমাজরূপী বিরাটপুরুষের পূজা পরিসমাপ্ত হয়।

কর্ত্তব্য।

"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ।" (উপনিষৎ)

'এই পৃথিবীতে আসিয়া কর্ম্ম করিতে করিতে শতবর্ষ বাঁচিয়া থাকিতে বাসনা করিবে'। আর্য্যঋষিগণ সবলসুস্থদেহে ন্যূনাধিক একশত বৎসরকাল সানন্দ মনে কর্ম্মময় জীবন যাপন করিতেন, এবং তদীয় বংশধর আমাদিগকে সেইরূপ করিতে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। বাস্তবিক বাঁচিয়া থাকিতে হইলে কর্ম্ম করিতে হইবে। 'Labour is life,' শ্রমশীল জীবনই জীবন। কর্ম্মহীন জীবন, মরণ তুল্য,—

পাশ্চাত্য কবি বলিয়াছেন,—

"I slept and dreamt that life was beauty ;

I woke and found that life was duty."

ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিলাম—জীবন বিলাস-সৌন্দর্য্যময়, সখের জিনিষ ; জাগিয়া দেখিলাম—জীবন কর্ত্তব্যময়, সখের জিনিষ নয়। মানব যখন অজ্ঞান-অবস্থায়, মোহনিদ্রায় অভিভূত থাকে, তখন জীবনটা খেলার সামগ্রী বলিয়া মনে করে, কিন্তু মোহ ছুটিয়া গেলে বুঝিতে পারে—

এই পৃথিবী একটা বিশাল কর্ম্মশালা। এখানে সকল মানুষকেই কর্ম্মের জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। সেই আহ্বানে যে কর্ণপাত না করিবে, তাহাকে কোন না কোন প্রকারের দণ্ড ভোগ করিতেই হইবে।

মানব জীবন কর্ত্তব্যসূত্রে গ্রথিত। 'লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।' লোক-সমাজ কর্ম্মডোরে বাঁধা। ঋণজালে জড়িত। জন্মদিন হইতে মহাপ্রস্থানের দিন পর্য্যন্ত এই ঋণদায় হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টাতেই মানুষের মনুষ্যত্ব। আর্থিক ঋণ পরিশোধ করা যেমন মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য, সেইরূপ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ-ভাবে যাহা গ্রহণ করিয়া জীবন পরিপোষণ করে, তাহার প্রতিদান করিতে সে বাধ্য। সভ্যসমাজে পরের সাহায্য না লইয়া কেহই জীবন ধারণ করিতে পারে না। সেই সাহায্য-আদানই ঋণ। সমাজের নিকট সকলেই ঋণগ্রস্ত। সেই ঋণ শোধ করিতে সকলেই ন্যায়তঃ, ধর্ম্মতঃ বাধ্য। এবং ইহারই নাম কর্ত্তব্য।

কর্ত্তব্যের নির্ণায়ক কে?

আমাদের ভিতর হইতে কে যেন বলিয়া দেয়,—এরূপ কর, ঐরূপ করিও না। পিতামাতা এত দুঃখ করিয়া আমাদের লালনপালন করিয়াছেন, ইঁহাদের দুঃখ দূর করা কর্ত্তব্য, ইঁহাদিগকে সকল রকমে সন্তুষ্ট করা উচিত। একথা প্রকৃতিস্থ সন্তানের মনে স্বতঃই উদয় হয়। অপর কেহ না বলিয়া দিলেও বাল্যে ভ্রাতার প্রতি ভ্রাতার কেমন একটা প্রাণের টান থাকে। কিন্তু এমন দুঃশীল ভ্রাতাও আছে, যে, ভ্রাতা ভগিনীর সহিত কেবল কলহ করে। তখন পিতামাতা সেই দুর্ব্বৃত্ত তনয়কে উপদেশাদি দ্বারা সৎপথে আনিতে চেষ্টা করেন। সেইরূপ, গ্রামস্থ, দেশস্থ সকল লোকের প্রতি ভালবাসা মহাত্মাদিগের হৃদয়ে আপনা হইতেই জন্মিয়া থাকে। পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্যবোধ যেমন সুসন্তানের স্বাভাবিক, সেইরূপ জননী জন্মভূমির প্রতি কর্ত্তব্য-জ্ঞান মহতের মনে স্বতঃই জাগে। কিন্তু এইরূপ স্বাভাবিক জ্ঞান

সকলের নাই। মহতের সাধুদৃষ্টান্তে তাহাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান জাগিয়া উঠে এবং বিস্তারলাভ করে। সাধারণ লোকের ত কথাই নাই, সময়ে সময়ে বিজ্ঞেরাও কর্ত্তব্যনির্ণয়ে সন্দিহান হইয়া থাকেন। সুতরাং নিঃস্বার্থ লোকহিতৈষী মহাপুরুষদিগের পদচিহ্ন ধরিয়া তাঁহাদের পথে বিচরণ করা সকলের পক্ষেই শ্রেয়ঃ। 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ'। মহাজনগণ যে পথে বিচরণ করিয়াছেন বা করেন, সেই পথই প্রকৃত পথ।' ঈশ্বরানুপ্রাণিত শক্তিশালী মহাপুরুষগণের উপদেশবাণী শাস্ত্রে নিবদ্ধ হইয়া আমাদের কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণের পক্ষে যথেষ্ট আনুকূল্য করে।

মানবের কর্ত্তব্যগুলিকে এই কয় ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। ভগবান্ ও নিজের সম্বন্ধে কর্ত্তব্য। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে কর্ত্তব্য।

ভগবানের প্রতি কর্ত্তব্য।

সকল দেশের ধার্ম্মিক সাধুগণ বলিয়া গিয়াছেন, বিশ্বমাঝে যে বিশ্ব-আত্মা বিরাজ করেন, তাঁহার পূজা, আরাধনা সকলেরই কর্ত্তব্য। ঈশ্বরে যাঁহার বিশ্বাস আছে, তিনি অবশ্যই স্বীকার করিবেন যে, ঈশ্বর-উপাসনায় আমাদের পাপরাশি ক্রমে বিদূরিত হয়। কিন্তু আমরা সে বিশ্বাস হারাইতেছি। এবং ভগবানের প্রতি, অবিশ্বাসীর কোন কর্ত্তব্য নাই। পাশ্চাত্যদেশের সংশয়বাদ এদেশে প্রবেশ করিয়াছে। কিন্তু 'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি' সন্দেহাত্মা লোক বিনষ্ট হয়। একথা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন। আমরা মনে মনে সংশয় পোষণ করিলেও সে কথা মুখে প্রকাশ করিতে সাহস পাই না।

যেহেতু সংশয়টা তীব্র নহে, বিশ্বাসও অস্তে যায় যায়। আমাদের মনের অবস্থাটা সন্ধ্যাকালের ঘোর-ঘোর, আধ-আধ ভাব; না-আলোক, না-আঁধার। কোন বিষয়েই আমাদের আঁট নাই। কোন কিছুই আমরা শক্ত করিয়া ধরিয়া রাখিতে পারি না। মনের যেন পক্ষাঘাত রোগ জন্মিয়াছে। আগে ব্রাহ্মণগণ এরোগের চিকিৎসা-কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। এখন কি তাঁহারা উদাসীন থাকিবেন?

আজকাল লোকের আয়ু এতই অল্প যে, বৃদ্ধলোকের সংখ্যা খুব কম। যাঁহারা সৌভাগ্যবশতঃ বার্দ্ধক্যে উপনীত হন, তাঁহাদের নিকটও বালকেরা ধর্ম্মকথা শুনিতে পায় না। কিন্তু তাসপাশা খেলিতে শিখে।

'বৃদ্ধা ন তে যে ন বদন্তি ধর্ম্মম্।'

বৃদ্ধ হইয়াও তাহারা বৃদ্ধ নয়, যাহারা ধর্ম্মকথা বলে না। ধর্ম্মের বক্তা বা শ্রোতা আজকাল দুর্ল্লভ। কারণ, ধর্ম্মকথা আমাদের ভাল লাগে না। যাহারা বৃদ্ধকালে ধর্ম্মার্জ্জন করিবেন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন, তাহারাও শিক্ষার অভাবে বা অভ্যাসের দোষে ভগবানকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে পারে না। 'ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে'। বিষয়চিন্তা করিয়া পুরুষ বিষয়ের প্রতি অতিমাত্র আসক্ত হইয়া পড়ে। তাহার মন কেবল বিষয়-ভাবনাই করে। ঈশ্বর-উপাসনা করিতে গিয়া বৃদ্ধের অবাধ্য মন নানা দিকে ধায়। টাকার কথা, মোকদ্দমার কথা, কত কথাই তাহার মনে পড়ে। বস্তুতঃ বাল্যকাল হইতে ঈশ্বর-আরাধনায় অভ্যস্ত না হইলে শেষে ধর্ম্মার্জ্জন সুকঠিন হইয়া পড়ে।

আমাদের ধর্ম্মানুষ্ঠান যাহা আছে, তাহা প্রাণহীন, বৃথা আড়ম্বর-পূর্ণ। আমরা ঈশ্বরসম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য নিজে করিতে চাই না, অন্যের দ্বারা করাইয়া লই। শিক্ষকমহাশয় ছাত্রকে বলিয়া থাকেন—মন

দেও, বিদ্যা নেও। বিদ্যার মূল্য মন, বেতন নহে। সেইরূপ, ধর্ম্মগুরুর আদেশ এই যে—হৃদয় দেও, ঈশ্বরপ্রসাদ নেও। ভগবানকে হৃদয় মাঝে বসাইয়া নিজে তাঁহার পূজা কর। তাঁহার উপাসনায় টাকা পয়সা কিছুই লাগে না, পশুবলিরও প্রয়োজন হয় না। অহঙ্কারকে বলি দেও। নীরবে বিনা আড়ম্বরে গোপনে প্রাণ খুলিয়া তাঁহাকে ডাক। তাঁহার মহীয়সী শক্তিতে নির্ভর কর।

ঈশ্বরে ভক্তি-বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য বালকদিগকে ধর্ম্মগ্রন্থ শুনাইতে হইবে, তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া আরাধনা করিতে হইবে। কিন্তু এই প্রকার উপদেশ কয়জনে পালন করে?

নিজের প্রতি কর্ত্তব্য।

ভগবান্ আমাদিগকে স্নেহ, দয়া প্রভৃতি সৎবৃত্তি দিয়াছেন। সেগুলির সৎব্যবহার, সংরক্ষণ ও উৎকর্ষসাধন করা মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য। আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি ও শক্তি দিয়া তিনি আক্ষুদ্র সকল-শ্রেণীর প্রাণীকেই এখানে পাঠাইয়াছেন। আত্মরক্ষা প্রাণীমাত্রেরই ধর্ম্ম। কিন্তু আত্মরক্ষা ও আত্মত্যাগেই মানুষের মনুষ্যত্ব।

নিজের সহিত প্রকৃত পরিচয় হওয়া আবশ্যক। আমি কে, আমি কি, আমার কতটুকু শক্তি আছে, দোষ বা গুণ কি, দুর্ব্বলতা কোথায়, ইত্যাকার বিচারপূর্ব্বক আত্মপরীক্ষার প্রয়োজন। এ বিষয়ে পরীক্ষক ও পরীক্ষার্থী নিজেই। নিজকে নিজের নিকট পরীক্ষা দিতে হইবে। এই পরীক্ষার উপযুক্ত পরিচালনা মনুষ্যত্বলাভে আনুকূল্য করিবে। পরচ্ছিদ্র অন্বেষণ না করিয়া আত্মচ্ছিদ্রান্বেষী হইলে বিশেষ লাভ আছে। নিজের শক্তির পরিচয় পাইয়া, সেই শক্তির উপর নির্ভর করিয়া

চলিতে পারিলে, শক্তির বৃদ্ধি হইতে থাকে। আবার, আমি অশক্ত-অক্ষম, এই প্রকার যাহার ধারণা, শক্তি থাকিতেও সে শক্তিহীন। পরের শক্তিতে কেহ কখনো শক্তিশালী হইতে পারে না। আত্মনির্ভর না থাকিলে কেহই মনুষ্যপদবীর অধিকারী নহে।

সকলেই যদি আত্মনির্ভরশীল হয়, তবে একতার বিঘ্ন জন্মিবে, এরূপ আশঙ্কা অমূলক। বরং আত্মনির্ভর না থাকিলেই লোকের মধ্যে একতার অভাব হইবার অধিকতর সম্ভাবনা। স্বাবলম্বন আর সম্মিলন পরস্পরবিরোধী নহে, প্রত্যুত অনুকূল। আত্মপ্রতিষ্ঠা ও নিজের সুখসুবিধার জন্য, স্বাতন্ত্র্য ও স্বাবলম্বনের প্রয়োজন। আবার, দশের কাজে দশের সহিত ঐক্য-মিলন আবশ্যক। যে সকল জাতি আত্মনির্ভরশীল, তাহারা কেমন একতাপ্রিয়! যেখানে স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজন, সেখানে সকলেই পৃথক্ • পৃথক্। যেখানে একতার দরকার, সেখানে সকলে একজোট।

ভদ্রলোকের মানরক্ষা করা যেমন ভদ্রলোকের কর্ত্তব্য, সেইরূপ নিজে ভদ্র বলিয়া জ্ঞান থাকিলে, আপনার মান রক্ষা করিবার ইচ্ছা আপনা হইতেই হয়। যাঁহার আত্মসম্মান বোধ আছে, তিনি পরের প্রাপ্য মানদানে কুণ্ঠিত নহেন; আমার নিজের সম্মান রক্ষা করিতেও বদ্ধকক্ষ। পরকে মানদান করিবে, পরের নিকটও নিজের প্রাপ্য মান আদায় করিবে। মানুষ বলিয়া যাহার জ্ঞান আছে, তাহারই আত্মমর্য্যাদা আছে। কিন্তু অহঙ্কার থাকা অনুচিত। আত্মপরীক্ষার অভাবে অহঙ্কার আসিতে পারে। ইহা মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নহে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ভগবানে নির্ভর করিতে হইবে। আবার, আত্মশক্তির উপর নির্ভর এবং আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানও থাকা চাই। ইহা

বিসদৃশ কিনা? শ্রীচৈতন্য উপদেশ দিয়াছেন—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥"

তৃণ অপেক্ষাও নীচ, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু, মানশূন্য ও মানপ্রদ হইয়া, সদাকাল হরি কীর্ত্তন করিবে।

এ কথার সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত কথার মিল কোথায়?

ঈশ্বর অনন্ত-শক্তি, আমি অতি ক্ষুদ্র-শক্তি, অনন্তশক্তির কাছে আমার শক্তি তুচ্ছ, আমি তৃণ হইতেও হীনশক্তি। ঈশ্বর আমাকে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে ফেলিয়া রাখুন না কেন, আমি অম্লানবদনে সহ্য করিব। ভগবান্ যিনি জগৎ-পূজ্য, তাঁহার প্রতি ভক্তি সম্মান দেখাইব, তাঁহার পূজা করিব, তাঁহার কাছে আবার আমার মান কোথায়? এই প্রকার ভাব লইয়া ভগবান্‌কে ভজিব। ভগবানের সেবায় এই ভাব, কিন্তু সংসারক্ষেত্রে এই দৈন্য কাপুরুষোচিত। আমি দীনহীন, অধম-অক্ষম, এইরূপভাব মনের মধ্যে সর্ব্বদা জাগিতে থাকিলে, মানুষের কর্ম্মক্ষমতা ও পুরুষত্ব ক্রমে লোপ পায়। আর, যে পর্য্যন্ত ভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে না পারা যায়, সে পর্য্যন্ত আত্ম-নির্ভর থাকা আবশ্যক।

পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে কর্ত্তব্য।

প্রথমতঃ কর্ত্তব্যের জ্ঞান, পশ্চাৎ সাধন; অগ্রে সদসৎ বিচার, উচিত-অনুচিত বোধ, শেষে অনুষ্ঠান। আমাদের কর্ত্তব্যজ্ঞান লুপ্ত না হইলেও সুপ্ত। ইহাকে জাগাইতে হইবে। কেবল পারিবারিক ক্ষুদ্র কয়েকটী কর্ত্তব্য প্রতিদিন পালন করাই জীবনের উদ্দেশ্য নহে।

পরার্থ মহত্তর কর্ত্তব্যপালনেই মনুষ্যজীবনের সার্থকতা। ইহাতেই ঊর্দ্ধগতি, উন্নতি। অতি নিম্নশ্রেণীর কর্ত্তব্য অথবা যাহা উন্নতব্যক্তির অকর্ত্তব্য, অক্ষম-অযোগ্য ব্যক্তি তাহাই কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করে।

সমাজ সহস্র সহস্র বিভিন্ন পরিবারের বিরাট্-সমষ্টি; সুতরাং সামাজিক জীবনের কর্ত্তব্য পারিবারিক জীবনের কর্ত্তব্যানুরূপ। স্নেহ-প্রেম-দয়া, ধৈর্য্য-শৌর্য্য, কর্ম্মকুশলতা প্রভৃতি গুণ উভয়ত্রই আবশ্যক।

মানবজীবনে অসংখ্য কর্ত্তব্য। তাহা আবার জাতিভেদে, সমাজ-ভেদে, ব্যক্তিভেদে, সময়ভেদে বিভিন্ন। সুতরাং মানবের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা বড় কঠিন কার্য্য।

শাস্ত্রে যে সকল কর্ত্তব্যের কথা উল্লিখিত আছে, তাহার অনেক-গুলিই এই দুইটী কথায় ব্যক্ত করা যাইতে পারে। (১) পরের উপকার কর; যেমন দান আতিথেয়তা ইত্যাদি। পরের অপকার (হিংসা প্রভৃতি) করিও না। (২) নিজের উপকার কর, অপকার করিও না।

দান।

সংসারের প্রায় সকল কার্য্যই দান-আদান, দেওয়া-নেওয়া, এবং আদান-প্রদান, নেওয়া-দেওয়ার উপর নির্ভর করিয়া চলিতেছে। যাঁহার যাহা আছে, তিনি তাহা দান করেন। যাঁহার যাহা নাই, সে তাহা গ্রহণ করে। দাতা ও গ্রহীতা লইয়া সমাজ। দাতার প্রতি গ্রহীতারও কর্ত্তব্য আছে। দাতা উপকারী, শ্রদ্ধার পাত্র। পিতা-মাতা জন্মদাতা, সস্নেহে অন্নবস্ত্রাদি দিয়া শিশুসন্তানদিগকে লালনপালন করেন, তাঁহারা পুত্রকন্যার ভক্তিভাজন। প্রজাবৎসল রাজা ভয়ত্রাতা,

অভয়দাতা; দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন ও ন্যায়ধর্ম্মের সংস্থাপন করিয়া প্রজার অশেষ উপকার করিয়া থাকেন। রাজভক্তি প্রদর্শন করা প্রজার কর্ত্তব্য। গুরু জ্ঞানদাতা, শিষ্যের ভক্তিভাজন। যিনি উপকারী, তাঁহার অনুগত, বাধ্য হওয়া, যথাশক্তি প্রত্যুপকার করা উপকৃতের অবশ্য করণীয়। অন্য কোন প্রকারের প্রতিদান করিতে না পারিলেও অন্তরের কৃতজ্ঞতা, ভক্তি-অনুরাগ দেখাইতে সকলেই পারে। সর্ব্বোপরি যিনি সর্ব্বমঙ্গলালয়, সর্ব্বসুখস্বরূপ, সেই ভুক্তি-মুক্তিদাতা পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তিমান্ হওয়া সকলেরই কর্ত্তব্য।

সমাজে অসংখ্য প্রকারের দান আছে। কিন্তু যিনি অকাতরে অর্থদান করেন, তিনিই সাধারণতঃ 'দাতা' নাম পাইয়া থাকেন।

দাতা বটে কোন্ জন ?
দেয়, কিন্তু চায়না কখন।

বাস্তবিক তিনিই দাতা, যিনি প্রতিদানে কিছুই চান না। যিনি দিয়াই সুখী, কিন্তু মান, যশ, উপাধি কিছুরই আকাঙ্ক্ষা করেন না, কিম্বা পরের দ্বারে কখনো অর্থ বা অন্য কোন কিছু ভিক্ষা করেন না, তিনিই দাতা। যে যাচ্ঞা করে, সে ভিক্ষুক, দাতা নহে। অবশ্য জ্ঞান-ধর্ম্ম সম্বন্ধে একথা খাটে না। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনাকারীকেও ভিক্ষুক বলা যায় না।

দানের জন্য ভারত চিরপ্রসিদ্ধ। কিন্তু আজকাল দাতার সংখ্যা কমিতেছে। কারণ, আমাদের অভাব অনেক বাড়িয়াছে, মনটাও কৃপণ হইয়াছে। তথাপি শিক্ষার উন্নতিকল্পে কোন কোন মহাত্মা দান করিয়া আসিতেছেন। পুঁটিয়ার প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী শরৎ-সুন্দরী, কাশিমবাজারের দানশীলা মহারাণী স্বর্ণময়ী, বঙ্গের সৌভাগ্য-

বশতঃ, বিপুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়া পুণ্য দানব্রত অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইঁহারা উভয়েই বিপুল অর্থ পরার্থে ব্যয় করিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছেন।

মহামনা ভূদেব মুখোপাধ্যায় সংস্কৃত শিক্ষার জন্য প্রায় দুই লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। সম্প্রতি মহানুভব তারকনাথ পালিত ও ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ প্রত্যেকে বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য বহুলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। এই প্রকার বিপুল অর্থদানের উদ্দেশ্য অতি মহৎ, ফল বহুকালস্থায়ী, দেশব্যাপী। ভূদেবের দান তুলনায় অল্প হইলেও, আয়ের অনুপাত অনুসারে অতি বড়।

আতিথেয়তা।

'সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ'। অতিথির মধ্যে সকল দেবতার অধিষ্ঠান। 'অরাবপ্যুচিতং কার্য্যমাতিথ্যং গৃহমাগতে'। শত্রু হইলেও গৃহাগত অতিথির আদর-অভ্যর্থনা করিতে ত্রুটি করিবে না। শাস্ত্রে এইরূপ উপদেশ অনেক আছে। আগে অতিথিসৎকার গৃহস্থের প্রধান ধর্ম্ম ছিল। অতিথির পূজা করিতে লোকের কত আগ্রহ ছিল, তাহা বৃদ্ধেরা জানেন। এখানে এক মহাত্মার কথা বলিতেছি। ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমপুর-নিবাসী কালীকুমার দত্ত মহাশয় ময়মনসিংহে একজন শ্রেষ্ঠ উকীল ছিলেন। তাঁহার উপার্জ্জনের প্রায় সমস্তই অতিথি-সেবায়, কন্যাদায়গ্রস্ত, ঋণগ্রস্ত দরিদ্রলোকের সাহায্যার্থ ব্যয়িত হইত। তাঁহার বাসাবাড়ী একটী অন্নসত্র-বিশেষ ছিল। সেখানে থাকিয়া অনেক অনাথ উমেদার, অল্পবেতনভোগী কর্ম্মচারী, দরিদ্র ছাত্র নিয়ত আহার পাইত। ইহার উপর, অনেক

আগন্তুক অতিথি প্রায় প্রত্যহ আসিতেন। অতিথিদিগকে তিনি অতিশয় আদর-যত্ন করিতেন। তাহাদের জন্য অনেক প্রবস্ত বিছানা রাখিতেন। অভাব হইলে, নিজের বিছানাও তাহাদিগকে দিয়া নিজে সামান্য শয্যায় শুইতেন। তাঁহার নিকট দান চাহিয়া কেহই বিমুখ হয় নাই। এই জন্যই তিনি লোকের নিকট 'দাতা' উপাধি পাইয়াছিলেন। লোকমুখে শুনা যায়, তাঁহার এইরূপ নিয়ম ছিল যে—তিনি সকলের সঙ্গে একত্র বসিয়া আহার করিতেন। সকলে যাহা খাইতেন, তিনিও তাহাই খাইতেন। তাঁহার জন্য স্বতন্ত্র পাক হইত না। একদিন ভোজনকালে সকলকেই দুধ দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার নিজের দুধের বাটিতে দুধ কিছু বেশী পড়িয়াছে মনে করিয়া তিনি অতি দুঃখিত হইলেন। তার পর ভৃত্যকে ডাকিয়া বলিলেন,—তুমি অবাধ্য চাকর। তোমাকে স্পষ্ট বলিয়াছি, সকলকেই সমান দিতে হইবে। আমাকে কেন দুধ বেশী দিলে? চাকর বলিল,—আজ্ঞে না, বেশী দেই নাই। কিন্তু সেই কথায় কর্ণপাত না করিয়া তৎক্ষণাৎ তিনি চাকরটীকে জবাব দিলেন।

আগেকার লোকে এই প্রকারেই অতিথির সেবা করিতেন। কিন্তু এখন আর সে ভাব নাই। আজকাল সকলেই নিজ উদরের সৎকার করিবার জন্য ব্যাকুল। অতিথি-সৎকার করে কে? আমরা সার বুঝিয়াছি,—'অজ্ঞাতকুলশীলস্য বাসো দেয়ো ন কস্যচিৎ'। কুলশীল জানিনা এমন অপরিচিত লোককে স্থান দিতে নাই। সহরে ভদ্র-পরিবারে আহারাদি শেষ হইয়া গেলে, অন্যের ত কথাই নাই, স্ত্রীর বাপ-ভাই আসিলেও বোধ হয় তাহাদের ভাগ্যে অন্ন জোটে না, মিষ্টান্ন জুটিতে পারে। কুটুম্বের কাছে হয়ত গিন্নী আসিয়া বলেন—কয়লার

পাক, উনুন জ্বালান বড় কষ্ট, এবেলা না-হয় ভাত না-ই হইল। হায়! সভ্যতার খরতাপে, কয়লার জ্বালে রমণীহৃদয়ের কোমলবৃত্তিগুলিও শুকাইয়া যাইতেছে! পল্লীগ্রামেও প্রায় এই অবস্থাই দাঁড়াইয়াছে।

অহিংসা।

অহিংসা পরম ধর্ম্ম। 'Harm not, hurt not.' কাহারো অহিত-অনিষ্ট করিও না। প্রায় সকল উদার শাস্ত্রেই এই নীতির কথা শুনা যায়। আমরা ব্যাঘ্রাদি পশুদিগকে হিংস্রক বলিয়া থাকি। কিন্তু পশুর যদি বাক্‌শক্তি থাকিত, তবে সে নিশ্চয়ই বলিত, 'মানুষের ন্যায় হিংসালু জীব দ্বিতীয় নাই। ব্যোমবিহারী কত বিহঙ্গ ব্যাধের বাণে বিদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। জলসঞ্চারী ক্ষুদ্র-বৃহৎ কত অসংখ্য মৎস্য প্রতিদিন ধীবরের জালে বদ্ধ হইয়া প্রাণ হারায়। ধনী, জমিদার, মৃগাবিৎ মৃগয়াচ্ছলে বিজন অরণ্যে প্রবেশ করিয়া বৎসর বৎসর কত মৃগমৃগীর প্রাণসংহার করেন। কত হংস-কবুতর, ছাগ-ছাগী অপত্যস্নেহে গৃহে পালিত হইয়া গৃহস্থ-ঘাতকের নির্ম্মমহস্তে নিহত হয়, কে তার সংখ্যা করে! ইহারা নিরীহ জীব। মানুষের বধ্য কেন? কোন্ অপরাধে ইহাদের প্রাণ নেওয়া হয়? হায়! দগ্ধোদর! তোমার জন্যই কি পশুর সৃষ্টি! তোমার জন্যই কি পক্ষীর জন্ম! যে গাভীর দুগ্ধ পান করিয়া তুমি তৃপ্ত, সেও তোমার জন্য জীবন হারায়!

পশুপক্ষীকে ইতর জন্তু বলিয়া মানুষ ঘৃণা করে, মানুষকে নাকি খুব ভালবাসে। কিন্তু হায়! মানুষ মানুষকে যত হিংসা করে, এমন

ত আর কেহ করে না। পৃথিবীর সৃষ্টি হইতে আজ পর্য্যন্ত যুদ্ধে, বিনা যুদ্ধে মানুষের হাতে যত মানুষ মারা গিয়াছে, তার সহস্র ভাগের এক ভাগও পশুজাতি বধ করে নাই। হিংস্রক কে? পশু, না মানুষ?

এমন লোক প্রায় দেখা যায় না, যে জীবনে কাহাকেও হিংসা করে নাই। সংসারে কেবল হিংসা আর প্রতিহিংসা। তাই বিশ্ব-কারুণিক মহাপুরুষগণ বলিয়াছেন—জীবে দয়া পরম ধর্ম্ম।

অতি সংক্ষেপে অল্পকথায় সর্ব্বসাধারণের পক্ষে কর্ত্তব্য এই—বড় হও, গায়-পায় বড় হও। মাথাটা আর বুকটাকে বড় কর। আত্মীয় স্বজনকে লইয়া, নিজ গ্রামের, নিজ দেশের সকলকে লইয়া বড় হও।

বড় কে?

আত্মাটা যাঁর বড়, তিনিই বড়। আত্মশক্তিবলে যিনি সংসারে মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, তিনি বড়। নিজ শক্তিতে আমরা কে কত মহৎ কর্ম্ম করি, তাহা বর্ত্তমান সভ্যসমাজের কর্ম্মরাশি এবং আমাদের কৃত কার্য্যাবলীর তুলনা করিলেই বেশ বুঝা যায়। বড় কর্ম্ম করিয়াই লোকসমাজ বড় হয়। কিন্তু আমরা নিজের পায়ে দাঁড়াইতে শিখি নাই বলিয়া আমাদের কর্ম্ম ক্ষুদ্র। চীন-রমণী সৌন্দর্য্যের খাতিরে পাদুখানিকে ছোট করেন। ছোট হওয়ার দরুণ নিজ পায়ে দাঁড়াইতে না পারিয়া যদি সখীর স্কন্ধে ভর করিয়া চলেন, তবে তাহা তত লজ্জার বিষয় নহে, যেহেতু তিনি রমণী। কিন্তু পুরুষ হইয়া যদি কেহ নিজ পায়ে দাঁড়াইতে না পারে, তবে ইহা বড়ই লজ্জার কথা।

আমরা নিজকে নিরুপায় করিতে জানি, নিরুপায় হইয়া কেবল

কাঁদিতে পারি। কর্ম্মের পথ একটু পিচ্ছিল হইলেই অশ্রুজল ঢালিয়া আরো পিচ্ছিল করিয়া তুলি। কঠিন পাথর-মাটীতে হাঁটিতে যাইয়া পায়ের ব্যথায় কাঁদিয়া ফেলি। কিন্তু অশ্রুজলে পাষাণ গলে না, একথা ভুলিয়া যাই। ভুলিয়া যাই,—

রোদন আর অশ্রুজল,
অবলা জনেরই কেবল।

আমরা কাঁদি সত্য, কিন্তু একাকী, নিজের দুঃখে। পরকে লইয়া নয়, পরের দুঃখে নয়। যে পরের দুঃখে কাঁদে, সে পুরুষ। নিজের দুঃখে কাঁদে যে, সে কাপুরুষ। আমাদের কর্ম্মে পৌরুষের অভাব। পৌরুষহীন কর্ম্ম করিয়া কেহ বড় হইতে পারে না। বড় কর্ম্মই মানুষকে বড় করে।

বড় কর্ম্ম কি ?

যে কর্ম্মের ফলে বহুলোক বহুকাল সুখভোগ ও উন্নতিলাভ করে, তাহা বড় কর্ম্ম। যেমন কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কার। বিত্ত-বিভব, পদগৌরব প্রকৃতপক্ষে বড়ত্বের কারণ না হইলেও আজকাল সভ্যজগৎ ধন-ঐশ্বর্য্যের বলে বড় বলিয়া মনে করে। জার্ম্মেণি প্রভৃতি দেশের লোকেরা বুদ্ধি-কৌশলে, কলে-কলে সাইকেল, দেশলাই, ঘড়ি, ছড়ি, কাগজ, কলম প্রভৃতি কত জিনিষ তৈয়ার করিতেছে, আমরা এখানে বসিয়া বিনাশ্রমে মনের সুখে সে সব উপভোগ করিতেছি। বস্তুতঃ আমাদের আদান আছে, প্রদান নাই। ক্রয় আছে, বিক্রয় নাই। আমাদের বহির্বাণিজ্য নাই। বাণিজ্য অর্থ আদান-প্রদান, ক্রয়বিক্রয়। বাণিজ্যের উদ্দেশ্য ধনবৃদ্ধি। সভ্যসমাজ

প্রধানতঃ শিল্পদ্রব্য লইয়াই বাণিজ্য করে; তদ্দ্বারা প্রভূত ধন অর্জ্জন করে। আমরাও কল কারখানা করিয়া, বহু প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া, জাহাজ নির্ম্মাণ বা ক্রয় করিয়া, সাগর পার হইয়া দূর আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশে যাইয়া বাণিজ্য করিব। ইহা বড় কর্ম্ম।

কিন্তু অত বড় আড়ম্বরের কথায় কাজ নাই। আমরা নিরীহ-নিঃস্পৃহ জাতি। দেশে থাকিয়াই যেমন পারি ব্যবসা বাণিজ্য করিব। বেশ কথা। নিজ সমাজের কাছে সকলেই সকলটা চাহিবে, সমাজও সকলের সকল অভাব দূর করিবে। ইহাও বড় কর্ম্ম। যে সমাজ, সকল লোকের অন্নবস্ত্রাদি প্রয়োজনীয় বস্তু যোগাইতে পারে, সে সমাজও ধন্য। ইহারই জন্য সমাজে কর্ম্মবিভাগ আবশ্যক। কৃষক ও তাঁতিকুল অন্নবস্ত্র যোগাইতে না পারিলে লোকসকল অন্য সমাজের মুখপ্রেক্ষী হয়। প্রতি ব্যক্তির ও প্রতি বর্ণের কর্ত্তব্য আছে। সেই কর্ত্তব্যের অপালনে অধর্ম্ম ও অমঙ্গল। আজকাল সভ্যজাতিসমূহ শিল্পবাণিজ্য-ব্যবসায়ী। আমাদেরও প্রধানতঃ সেইরূপ শিল্পী বণিক্ হইতে হইবে।

বড় হওয়ার পথে কণ্টক।

হিতোপদেশকার বলিয়াছেন,—অলসতা, রুগ্ণতা, ভীরুতা, বিদেশ-গমনবিমুখতা এবং হীনাবস্থাতেও সন্তোষ এই কয়টী দোষ মহত্ত্বের ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকে। এই কয়েকটীর একটী থাকিলেই মহত্ত্বলাভ দুঃসাধ্য, সবগুলি থাকিলে ত আর কথাই নাই।

আলস্য ও রুগ্ণতা।

কর্ত্তব্যসাধনের পক্ষে প্রধান অন্তরায় শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বলতা। শরীরে বল না থাকিলে যেমন বলের কার্য্য করা অসম্ভব, সেইরূপ মনের দৃঢ়তা ও ইচ্ছার বল না থাকিলে, বৃহৎ কর্ম্ম আরব্ধ হইতে পারে, কিন্তু শেষ হয় না। সাহস-উদ্যম, উৎসাহ-স্ফূর্ত্তি ও ইচ্ছা-আনন্দ কর্ম্মের প্রাণ। বলের অভাবে এই সকল গুণ থাকিতে পারে না। দুর্ব্বল ব্যক্তি বাছিয়া বাছিয়া ক্ষুদ্র কর্ম্মকে কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করে। উচ্চ, মহৎ কর্ম্মকে (যাহার সাধনে বল-বীর্য্য, পৌরুষ-সাহসের আবশ্যক) কর্ত্তব্যের তালিকা হইতে খারিজ করে। পুরুষোচিত শ্রমসাধ্যব্যাপারে উপেক্ষা ও পরাঙ্মুখতায় পুরুষত্ব ক্রমে স্ত্রীত্বে পরিণত হয়। পুরুষ তখন কর্ম্মের মহিমা ভুলিয়া জড়িমা লইয়া অচল হইয়া পড়ে।

আমরা অনেকেই যে রুগ্ণ-দুর্ব্বল, আমাদের শরীরটাই তার সাক্ষী। দেহের ভিতরে দুই একটা রোগ বাড়ী-ঘর করিয়া বসে নাই, এরূপ বাঙ্গালীর সংখ্যা অল্প। অন্য কোন রোগ না থাকিলেও দুর্ব্বলতা-রোগ প্রায় সকলেরই আছে। ইহা দূর করা বড় কর্ম্ম।

অলসতা সকল অনর্থের মূল, সর্ব্বদোষের আধার, নরকের দ্বার। ইহা সুখস্বাচ্ছন্দ্য, এমন কি জীবনীশক্তিকে পর্য্যন্ত হরণ করে। রোগ-শোক, দুঃখ-দারিদ্র্য ইহার সহচর। অলসের মন সয়তানের প্রিয় নিকেতন। আজকাল আমরা বাবু হইতে শিখিয়াছি। বাবু নামে আমাদের বড় আনন্দ। কিন্তু, বাবু মরে ভাতে আর শীতে। অলস-বিলাসীর ভাতও জোটে না, শীতকালের শীতও ছোটে না। কেহ কেহ

বলিবেন, এখন আর আমাদের পূর্ব্বকালের জড়তা নাই। বড় বড় সহরে গেলে আমরা দেখিতে পাই, পিপড়ের জাঙ্গালের মত লোক সকল কেবল নানাদিকে যাতায়াত করিতেছে। সকলেই নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত; কেহই পরের কথা মুহূর্ত্তকালও চিন্তা করিতে অবসর পায় না। কিন্তু এত যে ব্যস্ততা ও কর্ম্মকোলাহল, এত যে ছুটাছুটী, তার ফল অতি সামান্য; বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া; পর্ব্বতের মূষিক-প্রসব। সারানিশি জাগিয়া থিয়েটার ঘরের দ্বারে বসিয়া পানের খিলি বেচিয়া, সারাদিন দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া মুড়ী-মুড়কী-মিঠাই বেচিয়া, অথবা এইরূপ ক্ষুদ্রকর্ম্ম করিয়া, কিম্বা চাকরি করিয়া কোন সমাজই বড় হইতে পারে না।

ভীরুতা।

আমরা যে ভীরু, সে সার্টিফিকেট আমরা অনেক দিন পাইয়াছি। বড় কর্ম্ম করিতে গেলেই সাহসের প্রয়োজন। সাহসের কর্ম্মে ভীরু কেবল বিপদ্ গণে, সুতরাং বিরত থাকে, বড়ও হইতে পারে না।

বিদেশ-গমন-বিমুখতা।

আজকাল বিদেশ ও সমুদ্রের নামে আমাদের মনে আতঙ্ক হয় না বটে; কারণ, আমরা ভূগোল পড়িয়া পৃথিবীর অনেক দেশ ও সমুদ্র কণ্ঠস্থ করিয়াছি; মানচিত্রেও সে সব দেখিয়াছি। কিন্তু বাস্তব সমুদ্রের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করিতে, সুদূর দ্বীপে যাইতে প্রাণ কাঁপে।

যাহা হউক, নানাদেশ পর্য্যটনে, আলো ও বায়ুর সাহায্যে চক্ষু ফোটে, অভিজ্ঞতা জন্মে। বৈদেশিক সমাজের অবস্থা দর্শনে নিজসমাজের

প্রকৃত অভাব-ত্রুটি বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়। তখন নিজেদের অভাব দূর করিবার একটা ইচ্ছা জাগে ইত্যাদি উপদেশ শ্রবণ করিয়া বিদ্যার্থী যুবকেরা কেহ কেহ সাগর পার হইয়া বিদেশে যাইতেছেন সত্য, তথাপি বলিতে হইবে আমরা বিদেশগমনে বিমুখ। ঘরে বসিয়া কে কবে বড় হইয়াছে? বড় হইতে হইলেই বিদেশ গমন আবশ্যক।

সন্তোষ।

শাস্ত্রে আছে—

সন্তোষামৃততৃপ্তানাং যৎ সুখং শান্তচেতসাম্।
কুতস্তদ্ ধনলুব্ধানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্॥

অর্থাৎ সন্তোষরূপ অমৃতপানে পরিতৃপ্ত, শান্তচিত্ত মহাত্মাগণের যে সুখ, সেই সুখ তাহারা কোথায় পাইবে, যাহারা ধনলোভে নানা দিকে ছুটাছুটী করে?

আবার,

Man wants but little here below,
Nor wants that little long.

এই পৃথিবীতে মানুষের অভাব অল্পই বটে, সেই অল্প অভাবও অধিককাল স্থায়ী নহে।

সন্তোষ সম্বন্ধে এইরূপ উপদেশ অনেক শুনিতে পাওয়া যায়। শান্তচেতা, বিষয়বিতৃষ্ণ মহাশয়ের পক্ষে সন্তোষামৃত পান সম্ভবপর বটে, কিন্তু অশান্ত চিত্ত সন্তোষের অধিকারী নহে। নবদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত রামনাথ তর্কসিদ্ধান্তের ন্যায় নিঃস্পৃহ লোক আজকাল কয় জন আছেন? আমাদের অভাব বিলক্ষণ

জাগিয়াছে। সুতরাং সেই অভাব দূর করিতে না পারিলে কিছুতেই মনের শান্তি হইতে পারে না। ক্ষুধা খুব জন্মিয়াছে, কিন্তু ক্ষুধা-নিবৃত্তির জন্য কোন উপায় না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায় কি? সন্তোষামৃত পান করা যায় কি? ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে ইহা সম্ভব হইলেও সমাজের পক্ষে অসম্ভব। আমাদের অভাবের অভাব নাই, কিন্তু বলের অভাবই সকল অভাবের মুখ্য ও মূল অভাব। বড় হইতে হইলে সর্ব্বাগ্রে এই মূল অভাবটা দূর করা আবশ্যক। নিজে নিশ্চেষ্ট হইয়া পরের সাহায্যে বড় হওয়ার আশা করা মূর্খতা।

কর্ম্মে আনন্দ।

প্রফুল্লতা চিত্তের বলাধান, ভগবানের একটী সুন্দর দান। ইহা সংসারে সুখের উৎস। ইহার অভাবে কর্ম্ম ক্লেশকর ভার বলিয়া বোধ হয়। আনন্দ লইয়া কর্ম্ম করিতে হইবে। কর্ম্ম করিয়া আনন্দ লাভ করিতে হইবে। ভিতর হইতে যখন আনন্দ উথলিয়া উঠে, তখনই কর্ম্মী কর্ম্মে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ। আমরা নানা অভাবে চিত্তের সেই প্রফুল্লভাব হারাইতেছি। সুতরাং কর্ম্মে বিশেষতঃ পুরুষোচিত বৃহৎ কর্ম্মে আনন্দ-স্ফূর্ত্তি পাই না।

একই রকমের পৌনঃপুনিক একঘেয়ে কর্ম্ম, নিরাশ-নীরস শ্রম, পর-চালিত, অনিচ্ছাকৃত কর্ম্ম অপ্রীতিকর ও অহিতকর। সর্ব্বদা অনিচ্ছায়, দায়ে ঠেকিয়া কর্ম্ম করিলে, সেই অনিচ্ছাকৃত কর্ম্ম কেবল দুর্ব্বহ ভারবৎ ক্লেশাবহ। কর্ম্মে রসানুভব ও আশার সঞ্চার করা কর্ত্তব্য। 'বাড়্‌তে বাড়্‌তে বাড়ে কি? আশা; কম্‌তে কম্‌তে কমে কি? আয়ু।' বীণার ধ্বনি যেমন কর্ণে মধু বর্ষণ করিয়া সমস্ত হৃদয়টাকে

নাচাইতে থাকে, সেইরূপ আশার বাণী যাহার হৃদয়কে নাচাইতে পারে, সে কর্ম্মে রস পায়। অলস-অকর্ম্মণ্যের এ হেন আশাও ফুরাইয়া যায়, আবার আয়ু থাকিতেই সে মরিয়া থাকে। সুরাপায়ী সুরার মধ্যে ও কর্ম্মী কর্ম্মের মধ্যে রস পায়। তা না হ'লে মত্ততা জন্মিতে পারে না। মদ-মত্ততার ফল অবসাদ। কর্ম্ম-মত্ততার ফল চিত্ত-প্রসাদ।

ভোগী বিলাসীরা মনে করে, এই শরীরটা ভোগের সাধন মাত্র। অতএব ভোগ করাই শরীর-ধারণের সার্থকতা। কিন্তু বস্তুতঃ কর্ম্মের দ্বারাই সুখ-ভোগ। মিত, নিয়মিত ও স্বেচ্ছাকৃত শ্রমে কর্ম্মশক্তি বাড়ে ও আনন্দ জন্মে। শ্রমবিমুখতায় নিরানন্দ।

কর্ম্মফল।

ইহকালে বা পরকালে, এখানে বা সেখানে, তুমি চাও আর না-চাও, কর্ম্মফল ভোগ করিতেই হইবে। কোন কোন কর্ম্মের ফল হাতে হাতেই পাওয়া যায়। কর্ম্মেই অবনতি, কর্ম্মেই উন্নতি, একথা হিতোপদেশকার সুন্দর উপমা দিয়া বুঝাইয়াছেন।

যাত্যধোঽধো ব্রজত্যুচ্চৈর্নরঃ স্বৈরেব কর্ম্মভিঃ।
কূপস্য খনিতা যদ্বৎ প্রাকারস্যেব কারকঃ॥

অর্থাৎ কূপখননকারী খনন করিতে করিতে ক্রমেই নীচে নামিতে থাকে। সেইরূপ মানুষ নিজকর্ম্মদ্বারা নীচে, আরো নীচে যায়। পক্ষান্তরে, প্রাচীর-নির্ম্মাতা রাজমিস্ত্রি ইট গাঁথিতে গাঁথিতে [illegible] উপরেই উঠে। সেইরূপ, নিজ কর্ম্মদ্বারা মানুষ উর্দ্ধে, আরও উঠিতে থাকে।

কর্ম্মের সার নিষ্কামকর্ম্ম। কিন্তু ইহা এখন আমাদের কাছে 'আদি কালের বাতিল কথা'র মত হইয়াছে। ইহা পুরাতন শাস্ত্রের পুরাতন কথা। সংসারী হইয়া একালে কে আর সেকালের নিষ্কামকর্ম্ম করিতে পারে? ইহা অসম্ভব। অসম্ভব নয়, একথা এ যুগের প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী শরৎসুন্দরী ও 'দয়ার সাগর সেই বিদ্যার সাগর' ঈশ্বরচন্দ্র প্রভৃতি মহাত্মগণ নিজ জীবনে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

আমরা সকলে মিলিয়া গা-ঝাড়া দিয়া বড় বড় কর্ম্মে লাগিয়া যাইব। কর্ম্ম করিয়া বিরাট্‌পুরুষের ও ভূমানন্দ ভগবানের পূজা করিব।

PRINTER—K. C. NEOGI, 91 2 MACHUABAZAR STREET, CALCUTTA.

ম্যাকমিলান্ এণ্ড কোং লিঃ কর্ত্তৃক প্রকাশিত বাঙ্গালা পুস্তকের তালিকা।

ইতিহাস ও ভূগোল।

ভারতবর্ষের ইতিহাস, ৩য় ও ৪র্থ মান, ই. মার্সডেন্ বি. এ. মূল্য
ও রায় রসময় মিত্র বাহাদুর এম্. এ. কৃত … … ॥৵০
ভারতবর্ষের ইতিহাস, ৫ম ও ৬ষ্ঠ মান ঐ ঐ … ৸৵০
নব শিক্ষাবিধাননির্দ্দিষ্ট ভূবিদ্যা, ৩য় ও ৪র্থ মান,
আর্. এন্. ঘোষ এফ্. আর. জি. এস্. কৃত … … ॥১০
সাধারণ ভূগোল বিবরণ। প্রথম খণ্ড—য়ুরেশিয়া। এম্. প্রোথেরো
এবং আর্. এন্. ঘোষ কৃত … … ॥৶০
প্রথম শিক্ষা ভূবৃত্তান্ত, ৩য় ও ৪র্থ মান, সি. মরিসন্ এম্. এ.
ও রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র ঘোষ এম্. এ. প্রণীত … ॥১০
মধ্য শিক্ষা ভূবৃত্তান্ত, ৫ম মান, সি. মরিসন্ এম্. এ. … ॥৵০
মধ্য শিক্ষা ভূবৃত্তান্ত, ৬ষ্ঠ মান, সি. মরিসন্ এম্. এ. … ১।০
বিদ্যালয় হইতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড। রায় সাহেব শ্রীঅঘোর নাথ
অধিকারী কৃত। … … … ১৲
বৃটিশ সাম্রাজ্যে ভারতের স্থান। শ্রীউপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কৃত … ৸০
ভারত-শাসন, জে. ম্যাক্লিন্ এম্. এ. কর্ত্তৃক প্রণীত … ।৶০
ভূচিত্রাবলী … … … … ॥৵০

সাহিত্য।

প্রথম পাঠ (রঙ্গিল চিত্র সহ), শ্রীজলধর সেন প্রণীত … ৶১০
দ্বিতীয় পাঠ „ „ „ … ৵০
সহজ পাঠমালা, শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্. এ. প্রণীত … ⁄১০
পাঠাবলী, (১ম মান), শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্. এ. প্রণীত ⁄১০
পাঠাবলী, (২য় মান), শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম্. এ. প্রণীত ৵০
পাঠাবলী, ৩য় ও ৪র্থ মানের জন্য, শ্রীরসময় মিত্র এম্. এ. কৃত ।৵০
প্রবন্ধ-কুসুম, ৫ম ও ৬ষ্ঠ মানের জন্য, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ
বন্দ্যোপাধ্যায় এম্. এ. প্রণীত … … … ।৵১০
সৎপ্রসঙ্গ। শ্রীঅবিনাশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী কৃত … … ৸০
আয়ুর্ব্বেদ পাঠ, ১ম ভাগ, কবিরাজ শ্রীসুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী কৃত … ।৵০
ঐ ২য় ভাগ, ঐ ঐ কৃত … ।৵০
[illegible] শ্রীকৃষ্ণগোপাল কবিরত্ন কৃত [illegible]